কস্তুর 'বা'

সাধনা সোম

সবিতা প্রকাশন
সি ৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী সাধনা দেবী
সবিতা প্রকাশন
সি ৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জুন—১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

আমার ধারণা, কস্তুর'বা'র প্রতি জনসাধারণের টানের পেছনে আসল কারণ আমার মধ্যে তাঁর নিজেকে হারিয়ে ফেলবার যোগ্যতা। এই আত্মবিলুপ্তি আমি জোর দিয়ে করিনি। তিনি নিজে নিজেই এই গুণ আয়ত্ব করেছেন। প্রথমে আমি জানতামই না যে এ জিনিস তাঁর মধ্যে আছে। আমার প্রথম দিককার অভিজ্ঞতা এই যে তিনি খুব উদ্ধত ছিলেন। আমার দিক থেকে সমস্ত চাপ সত্ত্বেও তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যা করার তাই করতেন। এর ফলে অল্প সময় বা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের মনোমালিন্য চলতো, কিন্তু আমার সমাজসেবার কাজ বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গেই আমার স্ত্রী ফুটে উঠলেন এবং বিচার বিবেচনা করেই আমার কাজে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। সময়ের গতির তালে আমি ও আমার জনসেবা একসঙ্গে মিলে গিয়ে এক হয়ে গেল। ধীরে ধীরে আমার কাজকর্মে তিনি নিজেকে লুপ্ত করে দিলেন। সম্ভবত ভারতের মাটি সকল স্ত্রীর মধ্যেই এই গুণ থাকাকে পছন্দ করে। সে যাই হোক আমার ধারণা তাঁর জনপ্রিয়তার কারণই এই।

তাঁর মধ্যে আত্মবিলুপ্তি সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায় আমাদের ব্রহ্মচর্যের জন্য। আমার চেয়েও ব্রহ্মচর্য তাঁর কাছে অনেক বেশী স্বাভাবিক হয়েছিল। প্রথমে সে সম্বন্ধে তাঁর খেয়াল ছিল না। আমি প্রস্তাব করি এবং 'বা' (আদর করে সকলেই তাঁকে ও নামে ডাকতেন) তা গ্রহণ করলেন নিজের বলে। তারপর থেকে আমরা সত্যিকারের বন্ধু হলাম। ১৯০৬ সাল থেকে, প্রকৃতপক্ষে ১৯০১ থেকেই, আমার সঙ্গে থাকার পেছনে একমাত্র আমাকে আমার কাজে সাহায্য করা ছাড়া 'বা'র অন্য আর কোন স্বার্থ ছিল না। আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে তিনি পারতেন না। যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে আমার কাছ থেকে দূরে থাকায় তাঁর কোন অসুবিধা হতো না, কিন্তু নারী এবং স্ত্রী হিসাবে তিনি চিরদিনের জন্য নিজেকে বিলুপ্ত করে দেওয়াকে কর্তব্য বলে মনে করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি আমার যত্ন করা থেকে বিরত হননি।

এম. কে. গান্ধী

| ১ |

॥ কস্তুরবা'র পায়ের কাছে ॥

কস্তুরবা'কে প্রথম দেখি ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে অথবা ঐ সময়ের কাছাকাছি, যখন গান্ধীজী আসেন পাঞ্জাব সফরে। আমার দাদা (প্যারেলালজী) অন্যান্য হাজার হাজার যুবকের মত গান্ধীজীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাতে আমার মা ও পরিবারের অন্যান্যরা অসুখী হন। আমাদের পরিবার ছিল বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের। ভবিষ্যতে আমার দাদাকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে পাঠাবার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। তার পরিবর্তে তিনি পরিবারকে ধাক্কা দিলেন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে একজন 'বিদ্রোহী' হয়ে। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চেয়েছিলেন আমার মা। উদ্দেশ্য, ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ করা। উত্তরে গান্ধীজী লিখলেন লাহোরে এসে ছেলে এবং গান্ধীজীর সঙ্গে একদিন কাটিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে মা যখন পৌঁছালেন, দেখলেন দু'জনেই কাজে এত ব্যস্ত যে তাঁদের কোন ফুরসৎই নেই দেখা করার। সেজন্য 'বা'র সঙ্গে কথা বলে এবং নিজের মনের বোঝা হাল্‌কা করেই তাঁকে সমস্ত দিন কাটাতে হ'ল। 'বা' সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কথা শুনলেন এবং তার বদলে দেশসেবার কাজে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তাঁকে যে সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে সে সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। গান্ধীজী আমার মাকে বিকালের দিকে যখন ডেকে পাঠালেন তখন তিনি অন্য মানুষ। যে সমস্ত কথা 'বা' তাঁকে

বলেছেন তা খুব গভীর দাগ কাটে তাঁর মনের উপর। 'বা' ও তো তাঁরই মত মা। যদি অতটা ত্যাগ 'বা' করতে পারেন তিনি পারবেন না কেন? এ কথাই মনে মনে ভেবে নিয়েছেন। তাই বললেন, "গান্ধীজী, আমার ছেলে প্যারেলালকে চার কি পাঁচ বছর আপনি রাখতে পারেন কাছে। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। স্বামীকে হারিয়েছি এখন ঐ ছেলেই আমার ঘরের একমাত্র আলো।"

আমি অত্যন্ত ছোট সে সময়, তবুও মায়ের সঙ্গে 'বা'র আলাপ-আলোচনার ছবি পরিষ্কারভাবে মনে আঁকা রইল। তিনি মা'র সঙ্গে সমান স্তরের মতই কথাবার্তা বলেছিলেন, এক স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্তা বলে ঠিক তেমনি। স্বামীর প্রতি 'বা'র অপরিসীম আনুগত্য এবং সেজন্য যে কোন পরিমাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি,—আমার মাকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর কাছে 'বা' সীতা সাবিত্রীর সমান হয়ে উঠেছিলেন। 'বা'র সহানুভূতি ও বুদ্ধিমত্তা তাঁকে শক্তি দিয়েছিল। মা নিজের ছেলের কথা ভাবছিলেন। যে দুর্যোগময় ভবিষ্যৎ সে নিজের জন্য বেছে নিয়েছে, কঠিন ও দুর্গম,—সেই পথের কথা ভেবে ভেবে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু 'বা'র সঙ্গে একদিন মাত্র কাটিয়ে বুঝতে পারলেন অন্ততঃ এই নূতন পরিবেশে মাতৃ-স্নেহ পাবে তাঁর ছেলে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমি 'বা'র খুব কাছাকাছি এলাম। দাদা আমাকে গান্ধীজীর আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইতেন প্রায়ই। কিন্তু মা তা পছন্দ করতেন না। মার মনে ভয় ছিল তাঁকে ছাড়া গেলে হয়তো বা আমি ও দাদার পথই নেবো এবং ফিরে আর নাও আসতে পারি। আশ্রম সম্বন্ধে তিনি যা শুনেছেন

হাতে নিজে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দাদা কিন্তু চেষ্টা ছাড়লেন না। বললেন একা চলতে পারা তো মস্তো সুবিধার কথা। মা'র কাছ ছাড়া হইনি কখনো। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব নিজের পায়ে দাড়াতে শিক্ষা বর্ণা শিশুদের শিক্ষার এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ,—দাদা এই মত পোষণ করতেন। অবশেষে মা কয়েকদিনের জন্য দাদার সঙ্গে যেতে দিতে রাজী হলেন। আমাকে নিতে এলেন দাদা। সেই রাতেই আমরা সবরমতী রওনা হয়ে গেলাম।

অতদিন বাড়ী থেকে দূরে থাকবো ভেবে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। আবার সে সঙ্গে নূতন কিছু দেখবার আশায় খুশীতে নেচে উঠলাম। আশ্রমে আমার বয়সী শিশুরা কত এগিয়ে গেছে সে সব আনন্দকর গল্প আমাকে শোনালেন দাদা। বললেন ওদের মধ্যে গিয়ে যাতে বোকা বনতে না হয় সেজন্য তখুনি যেন আশ্রমের প্রার্থনা শিখে নি। আমি সারাপথে খুব পরিশ্রম করে তার কাছ থেকে সান্ধ্য-প্রার্থনা শ্লোকের উচ্চারণ শিখি এবং আমাদের গন্তব্যস্থল আমেদাবাদে ট্রেন পৌঁছার আগেই মুখস্থ করে ফেলি।

যাত্রাকে মনে হ'ল সীমাহীন। সবচেয়ে লম্বা পথ যা এর পূর্বে পাড়ি দিয়েছি তা হলো লাহোর থেকে দিল্লী, এক রাতের পথ মাত্র। ট্রেনের মধ্যে একটি পুরোরাত এবং দিন কাটিয়ে অবশেষে আমরা আমেদাবাদের কাছাকাছি পৌঁছাতেই দাদা যখন দূরে সবরমতী আশ্রমের মিট্‌মিট্‌ করা আলো দেখালেন, ভাবাবেগে প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস হয়ে পড়লাম।

আমেদাবাদ ষ্টেশনে নামলাম। এক ভদ্রলোক আমাদের নিতে এসেছিলেন। জিনিসপত্র নামিয়ে দু'ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের

তুলে দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন। পরে দাদা বললেন, ঐ ভদ্রলোক পুলিসের গুপ্ত বিভাগের একজন অফিসার। তাঁর কাজ ছিল আশ্রম ও আশ্রমবাসীদের উপর নজর রাখা।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাত প্রায় দশটা তখন। সেজন্য গাড়ী চল্‌তে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। জাগলাম ছোট এক বারান্দার সামনে গাড়ী থামলো যখন।

আমরা আশ্রমে এসে পৌঁছেছি।

মাত্র গতকাল গান্ধীজী আশ্রমে ফিরে এসেছেন। আমরা যখন পৌঁছাই আশ্রমের সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বারান্দার উপর যেখানে রামদাস গান্ধী ঘুমাচ্ছিলেন, নামলাম সেখানেই। আমাদের স্বাগত জানালেন তিনি। দাদা তাঁর ও আমার বিছানা পাতলেন সেই বারান্দাতেই, মাটির উপর। আমরা শুয়ে পড়লাম। মেঝেতে শোবার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। জীবনে এইই প্রথম আমি শুয়ে জেগে রাত কাটলাম। কিছুটা শক্ত মেঝেতে শোবার জন্য, কিছুটা ভয় ও উত্তেজনায়।

চোখে ঘুম লেগে আসছিল। ঠিক সে সময়েই ভোরের প্রার্থনা-ঘণ্টা বেজে উঠলো সজোরে। মনে হলো বাজলো অনেকক্ষণ ধরে। তখন ভোর ৪টা। দাদা আমাকে 'বা'র বারান্দায় নিয়ে গেলেন। বাপু তখন মুখ ধুচ্ছিলেন। আমায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন যাত্রাপথ কেমন লেগেছে। তারপর দাদাকে বললেন এরপর থেকে বাপুর বারান্দায় 'বা'র কাছে যেন আমি ঘুমাই।

প্রার্থনার পর 'বা' আমাকে তাঁর কামরায় নিয়ে গেলেন। সামান্য যা কিছু জিনিসপত্র তাঁর ঘরে ছিল সবই চমৎকার পরিচ্ছন্ন-ভাবে সাজানো। এক বিন্দু ধুলো কোথাও ছিল না। সকালের জল খাবারের জন্য মেঝেতেই বসেছিল সকলে। 'বা' একটি

ছোট স্টোভ জ্বালালেন, কিছু কফি তৈরী করলেন। এইই প্রথম কফি খেয়ে দেখলাম। আমাদের বাড়ীতে ছোটবেলায় দুধ খেতে দেওয়া হ'ত, কফি বা চা কিছুই নয়। বড় জোর আশা করতে পারতাম একটু কোকো। কফি খুব রসিয়ে রসিয়ে খেলাম। যতদিন আশ্রমে ছিলাম 'বা'র সঙ্গেই সকালে জলখাবার খেতাম। তিনি এত ভালবাসতে জানতেন এবং এমন মায়ের মতো ছিলেন যে কখন জলখাবার সময় হবে তার জন্য সব সময়েই অপেক্ষা করতাম।

বাড়ীর জন্য ভীষণ মন কেমন করা ভাব এলো। মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে এসেছিলাম তাই, না হলে আসবার পরদিনই ফিরে যেতাম বাড়ীতে; মা'র কাছে। এখানে চারপাশে সব অচেনা মুখ। তাদের কথাবার্তা এক বর্ণও বুঝতাম না। সকলেই কথা বলতো হয় গুজরাটি না হয় মারাঠি ভাষায়। সে সব আমার কাছে 'বিদেশীভাষা'। তার উপর আবার বড্ড লাজুক ছিলাম আমি। কারো সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতাম। বাড়ীতে সব সময়েই থাকতাম মায়ের কাছে। আমার দুই ভাইই বয়সে অনেক বড়, তাঁরা স্কুল অথবা কলেজেই থাকতেন। ছুটির দিনে মাত্র আসতেন বাড়ীতে। আমার লেখাপড়া চলছিল বাড়ীতেই। সঙ্গীবিহীন শিশু হওয়ায় আমি 'বইপোকা' হয়ে পড়েছিলাম। ফলে আমার স্কুলে পড়া খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো ভাইদের চেয়ে অনেক আগেই ম্যাট্রিক পাশ করি। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বয়স অনুপাতে অনেক পিছিয়ে ছিলাম। কিভাবে বন্ধুত্ব করতে হয় জানতাম না, অচেনা কারো সঙ্গে দেখা হবে ভাবলে ভয়ে কাবু হয়ে পড়তাম। বাড়ীতেও কারো সঙ্গেই খুব বেশী একটা কথা বলতাম না। আশ্রমে এসে নিজেকে আরো বেশী একা একা মনে হতে লাগলো, অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়লাম। একমাত্র যাঁর সঙ্গে সহজ হতে পারতাম তিনি হলেন

'বা'। তাঁর নিজস্ব ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে তিনি অত্যন্ত মিষ্টিভাবে কথা বলতেন আমার সঙ্গে। অন্যদের ভীতির ভাব জাগতে পারে এমন কোন কথা বা ব্যবহার তাঁকে কখনোই করতে দেখিনি। সকল মহত্ত্ব ছাপিয়েও তাঁর মধ্যে ছিল জননীর সরল হৃদয় এবং তাঁর চারপাশের আবহাওয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল মাতৃসুলভ মনোভাব।

আশ্রমবাসিনী মেয়ে ও মহিলাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই প্রত্যেকদিন সকালে রান্নাশালে এক ঘণ্টা অথবা সেরকম কিছু সময় কাজ করতে হত। তারা সকলেই সেখানে বসে কথাবার্তা বলা, হাসা, গম পরিষ্কার করা, তরকারী কোটা অথবা আটার চাপাটি তৈরীর কাজ করতেন। 'বা'র সঙ্গে সেখানে গেলাম এবং আমার সাধ্যমত এটা সেটা করলাম। কারো কথাবার্তা বুঝতে পারতাম না বলে সেখানে আমার ভালো লাগতো না, কাজকর্ম ও মন টানতো না। কিন্তু 'বা' সেখানে বসতেন হাসিখুশীতে উজ্জ্বল এবং যতটা করার কথা তার চেয়েও বেশী করতেন। তাঁর কর্মশক্তিকে অসাধারণ বলতে হয়। যা কিছুই করতেন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা এবং পরিচ্ছন্ন করে তা' করতেন। এই বৈশিষ্ট্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন।

বাপুর কাছে তাঁকে বসে থাকতে কখনোই প্রায় দেখতাম না। কিন্তু তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি সব সময়েই বাপুকে অনুসরণ করতো। লক্ষ্য করতেন সবটুকু প্রয়োজন তাঁর ঠিকমত মিটছে কিনা এবং যাঁরা তাঁকে সেবা করছেন তা সময়মত হচ্ছে কি-না। একদিন দেখলাম দুপুরের প্রচণ্ড রোদের মধ্য দিয়ে তিনি আশ্রমের খাবার ঘরে যাচ্ছেন। 'বা'র কুটির থেকে বেশ কিছু দূরে ছিল খাবার ঘর। খবর নিয়ে জানতে পারলাম তিনি দাদা প্যারেলালকে খুঁজছেন। বাপু মধ্যাহ্নবিশ্রামের জন্য তৈরী হচ্ছেন, সে সময়ে

দাদার সেখানে থাকবার কথা। কিন্তু তাঁর দেখা নেই। জিজ্ঞেস করলাম দাদার বদলে সে কাজ আমি করতে পারি কি-না। "না, বাপুকে সেবা করবার সুযোগ ও হারাবে কেন? যাও, তাকে ডেকে আন। কিন্তু দেখো, যদি খেতে বসে তাহলে ডাকবে না;"—জবাব দিলেন 'বা'। নাকে মুখে গুঁজে দাদা খেয়ে উঠুন অথবা মাঝখানেই খাওয়া বন্ধ করে উঠে পড়ুন, 'বা'র মধ্যেকার মাতৃত্ব এ চাইছিল না।

কি করে কাপড় ধুতে হয়, জানতাম না। আশ্রমবাসীরা কাপড়-চোপড় ধুতে জানবে এটাই সকলে আশা করেন। আশ্রমের অন্যান্য শিশুরা যেমন করে আমি ও তা করবো স্থির করলাম। দেখলাম কুঁয়া থেকে জল তোলা বেশ কঠিন, তাই সবরমতী নদীতে আমার কাপড়-চোপড় ধুতাম। জল পরিষ্কার কি ঘোলা তা বিচার করতাম না। ফল হলো এই,- খুব তাড়াতাড়ি আমার কাপড়-চোপড় মেটোরঙ্ হয়ে দাঁড়াল। দাদা বা অন্য কারো এসবের দিকে দৃষ্টি ফেলবার সময় ছিল না। 'বা'র দৃষ্টি কিন্তু কিছুই এড়ায় না। আমাকে তিনি কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে শেখালেন এবং দাদাকে বলে দিলেন আমাকে সাহায্য করবার জন্যে। নিজে আমার কাপড় ধোয়ার কাজ করতে চাইলেন কিন্তু আমি রাজী হ'লাম না। কুঁয়ার ধারে গেলেই কেউ না কেউ আমাকে জল তুলে দিতেন। মনে সন্দেহ জাগলো এ নিশ্চয়ই 'বা'র ব্যবস্থাপনা।

আশ্রমে থাকার দিনগুলো যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে সে সময় একদিন বারান্দায় বসে বাপু পাশে রাখা ফাইলগুলো উল্টে দেখছিলেন। তাঁকে দর্শন করবার জন্য একদল লোক এসে পড়লো। তারা তাদের উপহার ইত্যাদি তাঁর সামনে রেখে আশ্রম

দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কাছে আর কেউ ছিল না। গান্ধীজী তাই আমাকেই বললেন ওদের ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। রওনা হতে যাবো, আমাকে ফিরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "তুমি নিজে আশ্রমের সব কিছু ঘুরে দেখেছ তো?" না, আমি দেখিনি। তিনি তখন অন্য কাউকে ডাকতে পাঠালেন যা'তে দর্শনকামীদের ভাল করে সব বুঝিয়ে আশ্রম দেখাতে পারেন। আমার মনে খুবই বাজলো তাঁর স্বভাবগত শান্তভাবে আমায় যখন বকলেন "তোমাব জায়গায় যদি কোন ইংরেজ মেয়ে হতো তাহলে তার আশেপাশের সব কিছু সম্বন্ধে অনেক আগেই সে ওয়াকেবহাল হতো! কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা 'বইপোকা' হয়ে পড়েছে। শুধু পরীক্ষা পাশ করাটাই যেন তাদের জীবনেব 'সব' হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি পাশ করতে না পারে তবে সমস্ত কিছুরই যেন অবসান হয়ে গেল। সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার জন্য তাদের আগ্রহ থাকবেই বা কেন? তাতে তো আর পরীক্ষা পাশের সুবিধা হবে না।" আমার লজ্জার আর সীমা সংখ্যা রইল না। সত্যিই আমি সাধারণতঃ বই হাতেই বসে থাকতাম কিন্তু তা করতাম আমার অন্য আর কিছু করার ছিল না বলে। ওখানকার পারিপার্শ্বিক এবং লোকজন সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা কারো কাছে গিয়ে বলতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতাম। 'বা' আমাকে উদ্ধার করতে এলেন এখানেও। আমার অসুবিধা তিনি বুঝতে পারলেন। বাপু এবং দাদাকে বললেন আশ্রম ও আমেদাবাদ সহরের আশেপাশের জায়গা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে।

বাপু আবার সফরে যাবার আয়োজন করছিলেন। আমার ছুটির দিনগুলোও খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছিল। তাদের

মতে একা একা ভ্রমণ করার বয়স তখনো আমার হয়নি। বাপু তাঁর সঙ্গে আমাকেও আগ্রা নিয়ে যাওয়া ঠিক করলেন। সেখান থেকে আমাকে দিল্লীতে আমার মায়ের কাছে পাঠানো সহজ ছিল।

আমেদাবাদ থেকে আমরা বোম্বে গেলাম। সেখানে এইই প্রথম আমি সমুদ্র দেখলাম। খুব একটা উত্তেজনা জাগলো সমুদ্র দেখে। আশ্রমে আমার জুতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। বম্বেতে একজোড়া কিন্‌তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেদিন দোকান বন্ধ ছিল আর সেইদিনই রাত্রিবেলা আগ্রার পথে ভূপাল রওনা হয়ে গেলাম। ভূপাল স্টেশনে রেলওয়ে ব্রীজ পার হ'বার সময় 'বা' লক্ষ্য করলেন আমি খালি পায়ে হাঁটছি। যেখানে থাকবার ব্যবস্থা, সেখানে পৌঁছেই 'বা'র প্রথম কাজ হলো তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তুলে রাখা চপ্পল জোড়াটি আমাকে ব্যবহার করার জন্য জোর করা। এভাবে প্রতিপদে তাঁর ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করছিলাম এবং তাঁর প্রতি অতি গভীর শ্রদ্ধা আমার মধ্যে দানা বাঁধতে সুরু করল।

ভূপালে 'বা' নবাবের মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকেও। রাজকীয় ঐশ্বর্য ইত্যাদি তাঁর মনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারলো না। তিনি রাজপরিবারের মহিলাদের সঙ্গে অতি সহজভাবেই কথাবার্তা বললেন। তাঁর কথাবার্তা শুনে কেউই বলতে পারবে না তিনি প্রায় নিরক্ষরা। যদিও পুঁথিগত বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তত বেশী নয়, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান, মানব প্রকৃতি এবং জীবন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল।

আগ্রা থেকে গেলাম দিল্লী। আমার ছুটির দিনগুলো প্রায় ফুরিয়ে আসার একদিন কি দু'দিন পরে মা ও আমি লাহোর রওনা

হয়ে গেলাম। আশ্রম জীবন এবং 'বা'র সঙ্গ আমার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। লাহোরের জীবন এখন আমার কাছে কৃত্রিম ও একঘেয়ে মনে হতে লাগলো। মনে মনে ঠিক করলাম খাদি পরবো, ঐ আশ্রমের মেয়েদের মতই সরলভাবে চলবো। কোনরকম ব্রত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবো না, এই সর্তে মা আমাকে আশ্রমে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। খাদি সম্বন্ধে তাঁর মনের মধ্যে বিশেষ ভয় ছিল। যদিও খাদি পরা সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা করিনি তবুও আশ্রম ঘুরে আসার পর মিলের তৈরী কাপড় আমি কিছুতেই পরতে পারলাম না। (বিদেশী কাপড়চোপড় অবশ্য আমাদের পরিবার আগেই ত্যাগ করেছিল)। মা প্রথমে বিরক্ত হলেন। ব্যবহার করার মত যে সব জামা কাপড় ছিল সেগুলো ব্যবহার করে শেষ করার আগে নূতন কিছু সেলাই করার অনুমতি দিলেন না। আমার কাছে মাত্র তিনটি কি চারটি খাদি জামা ছিল। সেগুলো নিয়েই আশ্রমে গিয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন সকালে একটি ধুয়ে দিতাম। প্রায় একমাস চালিয়ে নিলাম এভাবে। 'বা'র কাছে কাপড় ধোয়ার কায়দা-কানুন শিখে নিয়েছিলাম এবং লক্ষ্য করেছিলাম ইস্ত্রি না করেও খাদি জামাকাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। অবশেষে মা নরম হলেন। আমার জন্য আরো কয়েকটি খাদি জামাকাপড় করে দিলেন যা'তে ধোপার বাড়ী পাঠাতে অসুবিধা না হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় সুরুতে এই বিরোধিতা না থাকলে আমি হয়তো খাদি ছেড়ে দিতাম।

২

॥ লবণ সত্যাগ্রহ ॥

১৯৩০ সালে গ্রীষ্মের ছুটির সময় দাদার আগ্রহে আশ্রমে যাই। সে সময়ে তিনি ও বাপু লবণ সত্যাগ্রহের জন্য কারাগারে। 'বা' তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলেন কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও পুলিশের অন্যায় অত্যাচারের ফলে যাঁরা আহত হয়ে হাসপাতালে বা বাড়ীতে ছিলেন তাঁদের দেখাশোনা করে। লোকজনের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলছিলেন তাদের সাহস ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য। আমি আশ্রমে থাকাকালীন 'বা' দিন কয়েকের জন্য আশ্রমে এলেন। তখন দেখলাম তিনি একেবারে ভিন্ন রকমের। অনবরত পায়ে হেঁটে ও গরুর গাড়ীতে করে ঘুরে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। যেখানেই গিয়েছেন জনসাধারণের দুঃখকষ্ট দেখে ব্যথা পেয়েছেন, নিজেকে অসুখী বোধ করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর পুরাণ অথচ মিষ্টি মুখখানার উপর দৃঢ়তা ও কঠোর সংকল্পের ছাপ লেগে ছিল। স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী তখন সত্যাগ্রহী, চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ে ব্যস্ত। যে কারণে সত্যাগ্রহ, তা যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং পরিণামে জয় নিশ্চিত এ বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না। বাপুর বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা ছিল দৃঢ়মূল। তিনি রাজনীতি বুঝতেন না। কিন্তু বাপুকে জানতেন। বাপু সংগ্রামের নেতৃত্ব করছেন, তা'তে সমস্ত প্রাণ মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে এইটুকুই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হচ্ছিল ভারতের অগণিত মূক জনসাধারণের অন্তরাত্মা।

আশ্রম থেকে 'বা' তাঁর ছেলে মণিলাল গান্ধী, রামদাস গান্ধী এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্মীকে দেখবার জন্য গেলেন। ওঁরা সবরমতী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। আমাকেও সঙ্গে নিলেন। এর আগে আর কখনো জেলের মধ্যে ঢুকিনি। ঐ পরিবেশে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। রামদাস গান্ধী ও মণিলাল গান্ধীকে কারাপালের অফিসে আনা হলো। পুলিশ ও কারা-কর্মচারীরা তাঁদের ঘিরে রাখলেন। ঐ অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলো। কারাজীবনের নির্মম কঠোরতা তাঁদের মুখের উপর ছাপ ফেলেছে। কারাগারের পোষাকে তাঁদের দেখে অত্যন্ত বিচলিত হ'লাম। কিন্তু 'বা' সেই আগুনের মধ্য দিয়ে অনেকবার গিয়েছেন; নিজে তিনি বহুবার কারাগারে ছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারগুলোতে যে কঠিন দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন তার তুলনা সহজে মিলে না। অত্যন্ত শান্তভাবে তিনি তাঁর ছেলেদের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকালেন, কারাগারে তাঁদের সঙ্গে আর যে সব সঙ্গী ছিলেন তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। দেশের স্বাধীনতা লাভ কল্পে দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ তাঁর কাছে এত স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল যে নিজের স্বামীর এবং সন্তানদের কারাগৃহবরণকে সহজভাবেই গ্রহণ করতেন। আসল কথা হাজার হাজার দেশবাসী কারাগারের মধ্যে নিজেদের বন্ধ রেখেছেন, তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য কেন দুশ্চিন্তা করবেন?

১৯৩০ সালে 'বা'র কনিষ্ঠপুত্র দেবদাস গান্ধী পাঞ্জাবের গুজরাট কারাগারে বন্দী ছিলেন। 'বা'র সামনে পারিবারিক চক্রকে প্রসারিত করে সমস্ত মানুষকে তার মধ্যে গ্রহণ করার আদর্শ রেখেছিলেন বাপু। বৎসরের পর বৎসর 'বা' ও সেভাবে জীবন-যাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। দেবদাস তাঁর অতি স্নেহের

সন্তান। কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্য কারাগারের মধ্যে তিনি মাত্র একবার এসেছিলেন পাঞ্জাবে। বাকী সময়ে প্রায় নিয়মিতভাবে আমার দাদা ও অন্যান্য কর্মী যাঁরা সবরমতী জেলে ছিলেন, তাঁদের দেখতে যেতেন। নিজ সন্তানদের দেখে আনন্দ পাবার মত তুষ্টিবোধ করতেন এতে।

দেবদাস গান্ধীকে দেখবার জন্য 'বা' গুজরাট আসেন। তখন মা ও আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কারাকক্ষে সাক্ষাতের পর মা তাঁকে গুজরাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। শোভাযাত্রা এবং সে রকম কিছু পছন্দ করতেন না 'বা'। কিন্তু স্থানীয় কর্মীরা তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিতে চাইলেন নূতন করে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার জন্য। তারা তাঁর গাড়ীর সামনে ও পেছনে শোভাযাত্রা ধরণের একটা কিছু করলেন, যদিও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছিল তা না করবার জন্য। এতে 'বা' বিচলিত হবেন, তারা বিশ্বাসই করতে পারলেন না। "কিন্তু নেতারা এসব ভালবাসেন যে" তারা বললেন। যা হোক, যখন দেখলেন সত্যসত্যই 'বা' এতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করছেন তখন নিরস্ত হলেন।

১৯৩১ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার আশ্রমে গেলাম। গান্ধীজী সেখানে ছিলেন না। মনে হয় সে সময়ে তিনি জেলে ছিলেন।* কিছুদিন পরে সবরমতী আসেন কিন্তু আশ্রমে থাকেন নি। 'ডাণ্ডি মার্চ' (লবণ সত্যাগ্রহ) সুরু করার সময় তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা শপথ নিয়েছিলেন স্বরাজ লাভ না করে আশ্রমে ফিরে আসবেন না। সেজন্য তিনি আশ্রম থেকে মাইল খানিক দূরে,

* ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী কারামুক্ত হন। অতএব ঐ সময়ে তিনি জেলের বাইরেই ছিলেন।—অনুবাদিকা।

গুজরাট বিদ্যাপীঠে উঠলেন। প্রতিদিন সকাল বিকাল কিছুক্ষণের জন্য আশ্রমে আসতেন। সবরমতী এসেছিলেন 'বা' ও। কিন্তু তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে রইলেন না। কারণ বিদ্যাপীঠে রাত্রিবেলা মেয়েদের থাকা নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্যদের মত তিনিও প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্য তাঁকে দেখতে যেতেন। তিন কি চারদিন পর গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সিমলা চলে গেলেন। 'বা' রয়ে গেলেন। সিমলা থেকে এক স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হলো যা'তে গান্ধীজী বম্বে জাহাজ ধরতে পারেন। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার জন্য জাহাজ তাঁকে নিয়ে যাবে ইংলণ্ডে। তাঁদের দলকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য আমি বম্বে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ইংলণ্ড যাবেন, একথা ভাবেন নি 'বা'। এমন কি স্বামীকে বিদায় দেবার জন্য বম্বে যেতে পর্যন্ত তাঁকে বলা হলো না। বৎসরের পর বৎসর গান্ধীজী নিজের জীবনকে ব্যয় করেছেন মাতৃভূমির সেবায়। তাঁর সময় এবং স্নেহের উপর চল্লিশকোটি ভারতবাসী প্রত্যেকের যেটুকু দাবী, 'বা'র ও ছিল মাত্র সেটুকুই ;—এই আদর্শই তিনি কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম প্রথম এ কাজ কঠিন ছিল কিন্তু বহু বৎসরের সংগ্রামের ফলে সে কাজ সহজতর হয়েছিল। এখন তাঁর কাছে এ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে গান্ধীজীর সঙ্গে শুধু তাঁরাই যাবেন কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য যাঁদের উপস্থিতি সেখানে দরকার।

১৯৩২ সালের প্রথম দিকে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরে আসবার পরেই গান্ধীজী আবার গ্রেপ্তার হলেন, তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো। আমার দাদা প্যারেলালও গান্ধীজীর সঙ্গে লণ্ডন গিয়েছিলেন। মা তাকে এবং অন্যান্য সকলকে স্বাগত জানাবার জন্য গিয়েছিলেন বম্বে। সেখানে একদিন কি দু'দিন

কাটিয়ে তিনি গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন এবং বাড়ী ফিরবার জন্য বিদায় নিলেন। ঠাট্টা করে বললেন গান্ধীজী,—"আমাদের স্বাগত জানবার জন্য এসেছিলেন। এখন আমাদের জেলে যাবার জন্য বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আমাদের অনুসরণ করুন না কেন?" তাঁব কথা নিবর্থক হ'তে দিতে চাইলেন না মা। মালপত্র খুলে ফেললেন, থেকে যাবেন স্থিব করলেন। কারা-যাত্রীদের বিদায় দেবাব সময় বইলেন। তারপর সত্যাগ্রহ করে নিজে গ্রেপ্তার হলেন। কিছুদিন 'বা'র সঙ্গে এক কারাগারেই কাটালেন। পরে প্রায়ই মা আমাদের বলতেন কারাজীবনেব দুঃখ দুর্দশাকে কেমন হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন 'বা'। যারা কারাগারে কখনো কাটান নি, তারা উপলব্ধি করতে পারবেন না একটা জায়গায় বন্দী হয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর; চারপাশে একই ধরণেব মুখ দেখে কাটানো কত কঠিন!



॥ 'বা'র বৃহৎ পরিবার ॥

১৯৩৫ সালে ওয়ার্ধা যাই, মগনবাড়ীতে গান্ধীজীর সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে দুই সপ্তাহ কাটাই। ঘর-সংসার সকল রকম কাজে, রোগীদের দেখাশোনা করায়, শ্রমিকদের কাছে তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপার ও ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশার কথা আলোচনা করায় এবং গান্ধীজীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখার কাজে 'বা' সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটছেন, দেখলাম।

সে বৎসরেই নবেম্বর মাসে আবার ওয়ার্ধা যাবার সুযোগ পেলাম। 'বা'র কনিষ্ঠ সন্তান দেবদাস গান্ধী সে সময় অসুস্থ ছিলেন। স্নায়বিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। যে রকম ধৈর্য ও ও গভীর অনুভূতি দিয়ে তিনি তাঁর যত্ন করছিলেন, তা অসাধারণ। ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মে তিনি তাঁকে সিমলা নিয়ে গেলেন। বাপু দেবদাসের সঙ্গে দাদা প্যারেলালকে পাঠালেন। কারণ দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বাড়ীর সকলে তাদের দু'জনকে বলতেন 'যমজ ভাই'। 'বা' দু'জনেরই যত্ন করতেন এবং দাদা আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর মাতৃস্নেহ ও সাধাবণ বুদ্ধি দেবদাসকে সারিয়ে তুলবার পক্ষে সর্ব ডাক্তারের মিলিত চেষ্টার চেয়েও অনেক বেশী ফলপ্রদ ছিল। তাঁর ভালবাসার শ্রম পুরস্কৃত হয়েছিল ;—দেবদাস সেরে উঠেছিলেন। 'বা' ফিরে এলেন গান্ধীজীর কাছে।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় গান্ধীজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাঃ বি, সি, রায় অভিমত প্রকাশ করলেন যে ফিরবার পথে কোন ডাক্তার তাঁর সঙ্গে থাকা দরকার। সে সময়ে আমি কোলকাতার 'অল্ ইণ্ডিয়া ইনিষ্টিটিউট্ অফ হাইজিন এ্যাণ্ড্ পাবলিক হেলথে'র ছাত্রী। সেখান থেকে একমাসের ছুটি নিয়ে তাঁর তদারকের জন্য চলে আসি। অবস্থার গতি এমন পথ নিল যে একমাসের বদলে দুই বৎসর রইলাম তাঁর সঙ্গে। সেবাগ্রামে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই 'বা' আমার দায়িত্ব নিলেন। গান্ধীজী এর আগেই সেবাগ্রামে বসবাস করছেন। 'বা'র ছিল একটি ছোট কামরা, একটি স্নানঘর ও একটি বারান্দা। আমার বাক্স প্যাট্রা তিনি সে ঘরে নিয়ে গেলেন। রাত্রিবেলা তাঁর কাছে শুয়েই ঘুমালাম। প্রথম প্রথম প্রায়ই সকালে উঠতাম এবং বারান্দার উপর বিছানা যেমনকে তেমন রেখে চলে যেতাম। 'বা' বিছানা তুলে

ঘরের মধ্যে নিয়ে রাখতেন একটি কথা ও আমাকে না বলে। পরে যখন তা জানতে পারলাম, অত্যন্ত লজ্জা পেলাম। আর কখনো তাঁকে একাজ করার সুযোগ দিয়েছি বলে মনে করতে পারছি না। আমি 'বা'র বিছানা ও গুটিয়ে তুলে রাখতে চাইতাম, কিন্তু আমার বিছানা গুটাবার আগেই তিনি নিজেরটা গুটিয়ে ফেলতেন। যদি তাঁর বিছানা আগে তুলতে যেতাম তো তিনি আমার বিছানা গুটাতে আরম্ভ করতেন। পারতপক্ষে কারো সেবা নেওয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকার মান সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল ; প্রায়ই দেখতাম অন্য কেউ তাঁর বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলে ও তিনি আবার গোছাতেন সে সব। বিছানার নিচেকার অপরিচ্ছন্নভাবে বিছানো কম্বল বা কাপড় ঠিকভাবে গুটাবার জন্যে তিনি ভারী মাদুর অথবা বিছানা তুলতেও দ্বিধা করতেন না।

দাদার মুখে শুনেছি গান্ধীজীর কাছে আসবার অল্পদিন পরেই রান্নাঘরে 'বা' কে সাহায্য করার পালা এলো তাঁর। দাদা দেখলেন কর্তব্যে তিনি কড়া। দাদার কাছে এসব কাজ একেবারে নূতন হওয়ায় বেশ অসুবিধায় পড়তে হলো। 'বা' নিজের ত্রুটিও ক্ষমা করেন না, অন্যান্যদের ত্রুটিও নয়। ময়লা, অগোছালো কিছু তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না। ঠিক তেমনি সহ্য করতে পারতেন না 'অনিয়ম' এবং 'ভুলে যাওয়া'।

পরে আগা খাঁর প্রাসাদে বন্দী শিবিরে একদিন আমাকে 'বা' তাঁর ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করতে বললেন। দুটো হুঁকের মধ্যে একটা খারাপ হয়েছিল, ব্যাগটি খুলতে হলে কৌশল ও অভ্যাসের দরকার। তাঁর চাওয়া জিনিস বের করে আনলাম, যে হুকটি ভাল ছিল সেটি বন্ধ করে অন্যটি যেমন ছিল

তেমনি করে ফেলে রাখলাম। দিন কয়েক পরে ব্যাগ থেকে আবার কিছু জিনিস বের করা দরকার হলো। তাঁর শরীর ভাল ছিল না। "এখানে আন, পরে ঠিকমত বন্ধ করতে পারি যেন," বললেন। "আমিই করবো 'বা'" বলায় কৌতুকে চোখ পিটপিট করে বললেন, "একটা দিক বন্ধ করতে ভুলে যাবে না তো?"

প্রার্থনায় যোগ দেবার জন্য তিনি ভোর ৪টায় উঠতেন। এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন। প্রার্থনার পর সে সময়ে বাপু আধ ঘণ্টা বা মিনিট পনেরো একটু ঘুমিয়ে নিতেন। কিন্তু ঐ অবসরটুকুতে 'বা' ব্যস্ত থাকতেন জলখাবার প্রস্তুত রাখবার জন্য। আশ্রমের মেয়েদের মধ্যে গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করবার প্রতিযোগিতা চলতো। 'বা' নিজের হাতে তাঁর সমস্ত কাজ করতে ভালবাসতেন। কিন্তু মেয়েদের নিরাশ করতে তিনি দুঃখ বোধ করতেন। নানাজনকে নানা দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাসের যোগ্য, বাধ্য; তা সত্ত্বেও 'বা'র সজাগ দৃষ্টি তাদের পেছনে প্রত্যেক জায়গাতেই ঘুরে বেড়াতো। তিনি দেখতেন যা'তে কাজ ঠিকমত সারা হয় আর পরিচ্ছন্নতার নিয়মকানুন রক্ষিত হয়।

জলখাবার তৈরী করে মেয়েদের কারো মারফতে গান্ধীজীর কামরায় নিয়ে যেতেন এবং খাবার সময় কাছে বসে থাকতেন। তারপর দেখতেন, যে মেয়ের বাসনপত্র ধোয়ার পালা, সে তা ঠিকমত করছে কি না। ধোয়া বাসনপত্রকে প্রায়ই আবার ধুতে দেখতাম। তাঁর থালা বাসন সব সময়েই উজ্জ্বল চকচকে হওয়া চাই-ই।

গান্ধীজী যখন সকালবেলায় হাঁটতে যেতেন, 'বা' স্নান সেরে নিতেন। তারপর রামায়ণ অথবা গীতা পড়তেন একঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা। তারপর রান্নাঘরে যেতেন গান্ধীজীর দুপুরের খাওয়া তৈরীর কাজ তদারকে। সেখানে তিনি সকলের জন্য যে রান্না হতো, তার

দিকেও নজর রাখতেন। গান্ধীজী সকলের সঙ্গে বসেই খেতেন। 'বা' গান্ধীজীকে এবং তাঁর কাছে বসা অতিথিদের পরিবেশন করতেন। তারপর তাঁর কাছে অন্যদিকে বসে নিজে খেতেন, কিন্তু সব সময়েই চোখ থাকত গান্ধীজীর থালার উপর। হাতে একখানা পাখা রাখতেন মাছি ও পোকা-মাকড় তাড়াবার জন্য যাতে গান্ধীজী শান্তিতে নিজের খাওয়া খেতে পারেন ও অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। খাওয়া ব্যাপার চলতো অন্ততঃ একঘণ্টা। তারপরে তিনি গান্ধীজির পেছনে পেছনে যেতেন তাঁর কুটিরে, পায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন দুপুরবেলা বিশ্রামের জন্য যখন গান্ধীজী শুতেন। ঘুমিয়ে পড়লে নিজের কুটিরে গিয়ে তিনিও একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতেন। বিশ্রামের পর বসতেন সূতা কাটতে। প্রতিদিন অন্ততঃ ৪০০ থেকে ৫০০ তার সূতো কাটতেন (চার ফুটে এক তার)। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতাম,—"বা', আপনার শরীর ভাল নয়। বিকালে আপনার আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এতখানি সূতো কাটবার কী প্রয়োজন আপনার?" কিন্তু হেসে আমার প্রতিবাদ তিনি সরিয়ে রাখতেন।

বিকালবেলা আবার রান্নাশালে যেতেন, গান্ধীজীর খাওয়া তৈরী করে খাবার সময় খাইয়ে আসতেন। দীর্ঘদিন ধরে 'বা' রাত্রিবেলা ঠিকমত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিকালে এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছুই খেতেন না। পরে কফিও ছেড়ে দিয়ে পরিবর্তে ঔষধ-পাতার রস খেতেন। গান্ধীজী যখন বিকালে হাঁটতে যেতেন 'বা' তখন আশ্রমের রোগী ও অন্যান্যদের তত্ত্ব তল্লাসী করতেন। কখনো কখনো অন্য বয়স্কাদের নিয়ে হাঁটতে যেতেন। গান্ধীজীর ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। ফিরে আসতেই হয়ে যেতো প্রার্থনার সময়। রামায়ণ গান থেকে আরম্ভ করে প্রার্থনায়

সমস্ত কিছুতেই তিনি অংশ নিতেন। রামায়ণ গানের জন্য আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রী তাদের পরীক্ষার জন্যও এমন যত্নে এবং নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করত না, সান্ধ্য প্রার্থনার জন্য 'বা' যেমন করে সকালবেলা রামায়ণের অনুচ্ছেদ মুখস্থ করতেন। সমান উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে গীতা পাঠ করতেন। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার পর 'বা' প্রার্থনা প্রাঙ্গণেই তাঁর দরবার বসাতেন। আশ্রমের সব মহিলারাই কাছে এসে বসতেন, কেউ তাঁর পা টিপে দিতেন, কেউ পিঠ মালিশ করতেন। সারাদিনের খবরাখবর আদান-প্রদান ও গল্পগুজব চলতো, অবশ্য তাঁদের নির্দোষ কথাবার্তাকে যদি 'গুজব' বলা চলে। আধঘণ্টা অথবা পৌনে এক ঘণ্টা এভাবে মহিলাদের সঙ্গে কাটাতেন। তারপর গান্ধীজীর, ছোট্ট নাতি কানুর এবং নিজের বিছানা পেতে রাখতেন রাত্রিবেলার জন্য।

৪

॥ আদর্শ সেবিকা ॥

ঐ সময়টিতে 'বা' রামদাস গান্ধীর ছোট্ট ছেলে কানুর দেখাশোনা করছিলেন অল্পবয়সী মায়ের মত উৎসাহ ও সজাগ দৃষ্টি নিয়ে। শিশুদের মনস্তত্ত্ব বেশ ভাল বুঝতেন। ফলে কানু কখনও নিজের মায়ের অভাববোধ করেনি। ঠাকুরমাই তার কাছে সব ছিলেন। ১৯৩৮ সালে রাজকোট সত্যাগ্রহে 'বা' অংশ নিলেন, ছোট্ট কানু পেছনে রইলো গান্ধীজীর হেফাজতে। 'মতিবা'র (কানু 'বা'কে তাই

বলে ডাকতো) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে অসুখী হলো। বাপুর বিশ্বাস ছিল অতি সহজেই তাকে বাগে আনতে পারবেন। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে তাঁর দেরী হলো না। সারাক্ষণ শিশু তার ঠাকুরমার জন্য কাঁদতো। গান্ধীজী পরাজয় স্বীকার করলেন, শিশুকে তার মায়ের কাছে পাঠাতে বাধ্য হলেন। কানুর মা তখন দেরাদুনের কন্যা গুরুকুলে কোন এক পরীক্ষার জন্য পড়ছিলেন।

১৯৩৭ সালে গান্ধীজী কোলকাতা থেকে ফিরলেন খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে। তাঁর রক্তের চাপ পবিবর্তন আশ্রমবাসী প্রত্যেককেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। 'বা' কিন্তু শান্ত, স্থির রইলেন। কোলকাতা থেকে আমরা ফিরলাম ডিসেম্বর মাসে। সেবাগ্রামে খুব ঠাণ্ডা। গান্ধীজী বহু বৎসর ধরে, খোলা জায়গায় ঘুমিয়েছেন। কিন্তু এখন শীত ও অতিরিক্ত কাজের ফলে তাঁর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য, ডাক্তারদের নির্দেশ ছিল শীত ও অতিরিক্ত কাজ ;—দুইকেই দূরে রাখতে। অনেক বুঝানোর পর তিনি ঘরের মধ্যে শুতে রাজী হলেন।

'বা'র কামরা ছিল ছোট। বাপুর কাছে আরো দু'একজন শুতেন। 'বা' নিজের কামরাটি বাপু ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য খালি করে দিয়ে নিজে ছোট নাতি কানুকে নিয়ে বারান্দায় ঘুমালেন। স্বামীকে তো বটেই, অন্যান্যদের জন্যও জায়গা ছেড়ে দিতে এক মিনিটের জন্যও তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন না। পরদিন সকালে গান্ধীজী বিছানায় বসে' জলখাবার খাচ্ছিলেন। স্মৃতি চারণ করার মত মন নিয়ে বললেন, "বেচারী 'বা' কখনোই নিজের জন্য একখানা কামরা পেলেন না। এই কুঁড়ে তৈরী করিয়েছিলাম বিশেষ করে ওঁরই জন্য। আর আমি নিজে সব খুঁটিনাটি তদারক করেছি। ভেবেছিলাম বুড়ো বয়সে ওঁরও কিছু

আরাম এবং নিরালা থাকার প্রয়োজন আছে। এখন আমি নিজেই এটা দখল করে বসেছি। এমনিতেই নিজের কুঁড়ের খোদ মালিক ছিলেন না। 'বা', আশ্রমের কয়েকজন মেয়েকে তাঁর কুটিরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আমার আসাব অর্থ হলো তাঁর ঘরটি সম্পুর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া। যেখানেই যাই, সেখানেই হয়ে দাঁড়ায় যেন একটি ধর্মশালা। এতে আঘাত পাই, কিন্তু স্বীকার করছি 'বা' কখনোই এ নিয়ে নালিশ জানান নি। আমার যা ভাল লাগে তাঁর কাছ থেকে নিতে পারি, তাঁর উপর যে কোন অতিথিকে ইচ্ছামত চাপাতে পারি, তিনি খুশী মুখে এবং স্বেচ্ছায় আমার এসব সহ্য করেন।" 'বা' ঘরে ঢুকলেন যখন গান্ধীজী কথা বলছিলেন। 'বা'র দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "তা-ই তো হওয়া উচিত। যদি স্বামী এক কথা বলেন, আর স্ত্রী বলেন অন্য কথা;—জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে! এস্থলে স্বামীরই সব বক্তব্য, আর স্ত্রী তা করতে প্রস্তুত।" 'বা' হেসে উঠলেন,—সকলেই যোগ দিলেন তা'তে।

ডাক্তারদের অনবরত পীড়াপীড়িতে তিনি হাওয়া পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রের ধারে যেতে রাজী হলেন। 'বা' আদর্শ সেবিকার মত তাকে সেবা করছিলেন, কোলকাতা হ'তে গান্ধীজীর আসবার পর থেকে তিনি নিজে বিশ্রাম নেননি। সব সময়েই দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রয়োজন মত যে কোন সেবা করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি জুহুতে গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে।

গান্ধীজী জুহুতে কাটালেন প্রায় ছু'মাস খানিক। এই বিশ্রামে তাঁর যথেষ্ট উপকার হলো। প্রতিদিন তিনি সকাল বিকাল সমুদ্র-তীরে হাটতে যেতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া 'বা'র সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে গান্ধীজী সুস্থ শরীরে সেবাগ্রাম ফিরে এলেন। অল্প সময় পরেই তাঁকে যেতে হলো

কোলকাতা। ‘বা’ প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর যাত্রা শুভ হোক। গান্ধীজী সুস্থ শরীরে থাকলে ‘বা’ কখনোই তাঁর সঙ্গে যাওয়াব জন্য জেদ করতেন না।

১৯৩৯ সালে গান্ধীজী উড়িষ্যার দেলাঙে গেলেন গান্ধী সেবা সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে। ‘বা’, তুর্গাবেন ও আশ্রমবাসী আরো অনেকেও দেলাঙে এলেন। জগন্নাথপুরীমন্দির বেশ কাছে। মিটিঙের শেষে ‘বা’, তুর্গাবেন, নারায়ণ এবং আরো কয়েকজন ঠিক করলেন পুরীর মন্দির দর্শন করে আসবেন। ‘বা’ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা ছিলেন। মন্দিরের বিগ্রহের প্রতি তাঁর ছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস! তিনি মন্দিরেব মধ্যে গেলেন, জগন্নাথদেবকে পূজা করলেন। তুর্গাবেন তাঁর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু তাঁর ছোট ছেলে বুদ্ধি করে বাইরেই রয়ে গেল। দেলাঙে তাঁরা ফিরে এলেন সন্ধ্যায়। যে মন্দিরে হরিজনদেব ঢুকতে দেওয়া হয় না, সেখানে ‘বা’ এবং তুর্গাবেন দর্শনে গিয়েছিলেন এ খবরে গান্ধীজি সুখী হলেন না। বিচারের মুখোমুখি হতে হলো ‘বা’কেই প্রথমে। ‘বিকালে ‘বা’র কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কৈফিয়ৎ চাইলেন কেন তাঁরা মন্দিরে গিয়েছিলেন! ‘বা’ শিশুর মত নিরীহ ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে দোষ স্বীকার করে মাফ চাইলেন। গান্ধীজির রাগ উবে গেল।

“দোষ আমারই,” বললেন বাপু। “আমি তোমার শিক্ষক হয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে সময় ও মনোযোগ যতটুকু দেওয়া দরকার তা দিইনি। তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে দেইনি আমি। তুমি কি আর করবে?” বাপু দলবল নিয়ে কোলকাতা ফিবলেন, ‘বা’ এবং তুর্গাবেন ফিরে গেলেন সেবাগ্রাম।

৫

॥ রাজকোট সত্যাগ্রহ ॥

১৯৩৮ অথবা ১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মের সময় সেবাগ্রামে কলেরা আরম্ভ হয়। আশ্রমিকদের উপদেশ দেই কলেরা প্রতিষেধক টিকা নেবার জন্য। গান্ধীজিকে বুঝিয়ে বলি যে সেবাগ্রামের গ্রামীণ জনসাধারণ কাজ করার জন্য প্রত্যেকদিন আশ্রমে আসছেন, এতে রোগের ছোয়াচ আনার যথেষ্ট বিপদ রয়েছে। ঠিক তারপরেই ওয়ার্ধা-মহিলা আশ্রমে কলেরার কয়েকটি ঘটনা ঘটে। কাকা সাহেব কালেলকার তাঁদের মধ্যে একজন এবং কয়েকজনের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। সেবাগ্রাম আশ্রমে মহিলা-আশ্রমের পুনরাবৃত্তি ঘটুক, আমরা তা চাই না। সান্ধ্য প্রার্থনার পর গান্ধীজী আশ্রমবাসীদের কাছে আমার প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, প্রতিষেধক টীকা নিয়ে প্রত্যেককে কলেরা থেকে রক্ষা করার কথা। কয়েকজন কোনরকম ইন্‌জেকশানেই বিশ্বাসী নন। ইন্‌জেকশান নিতে তাঁরা অনিচ্ছুক কিন্তু মুখে সেকথা জানাবার সাহস হলো না। অবশেষে 'বা' এগিয়ে এলেন। "যা-ই হবে হোক, আমি টিকা নিচ্ছি না,"—বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে। "যারা টিকা নেবে না," গান্ধীজি বললেন "তাদের আলাদা জায়গায় যেতে হতে পারে।" দরকার হলে 'বা' তা-ই করতে রাজী, কিন্তু টিকা নেবেন না কিছুতেই। ফল হলো এই, আশ্রমের খুব কম লোকেই টিকা নিলেন। আমরা গ্রামের প্রায় প্রত্যেক লোককেই টিকা দিলাম এবং কলেরার বিরুদ্ধে আমাদের এই জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে

শীঘ্রই কলেরার হাত থেকে গ্রামটি রক্ষা পেল। আশ্রম সম্পূর্ণ বেঁচে গেল।

১৯৩৮ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জোরালো আমন্ত্রণে গান্ধীজি মাসখানেকের জন্য বারদোলী গেলেন। সেখানে তাঁর থাকাকালীন সুরু হলো রাজকোট সত্যাগ্রহ। রাজকোটের ঠাকুরসাহেব তাঁর প্রজাদের কিছু রাজনৈতিক অধিকার দিতে সম্মত হয়েও কথা রাখলেন না। এই বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিবাদে জনসাধারণ সত্যাগ্রহ করার সংকল্প নিলেন। এ কথা শোনামাত্রই 'বা' চলে এলেন বাপুর কাছে। রাজকোট তাঁর নিজের জায়গা, সুতরাং রাজকোট সত্যাগ্রহে অংশ তিনি নেবেনই! বাপু অনুমতি দিলেন। ফলস্বরূপ গ্রেপ্তার হলেন 'বা', আটক রইলেন রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে। আটক-শিবির থেকে 'বা' ভারী মজার মজার চিঠি লিখতেন। বেশ আনন্দে ছিলেন সেখানে। শুধু বাপুর স্বাস্থ্যের জন্যই তাঁর যা কিছু সামান্য চিন্তা ছিল।

রাজকোটে 'বা' আটক হ'বার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধীজি নিজেই রাজকোট যাবেন স্থির করলেন। দাদা প্যারেলাল, কানু গান্ধী ও আমি তাঁর সঙ্গী হ'লাম। রাজকোটে 'বা'র সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন তিনি। আমরা ও সেই সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলাম। সরকার 'বা'কে এবার সব রকমে আরামে রাখার ব্যবস্থা করে। তা সত্ত্বেও তাঁকে খুব শ্রান্ত মনে হচ্ছিল। বাপুর কাছ থেকে দূরে থাকা আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। সাহসী হ'তে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর শরীর এ যন্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়ল।

এর অব্যবহিত পরেই বাপুর রাজকোট অনশন আরম্ভ হল। এ খবর তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করল কিন্তু এ ধরণের আঘাতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। খবর দেবার জন্য তাঁর কাছে আমাকেই

পাঠানো হলো। ছুঁচ্ ফোটাবার মত বেদনা-ভাব জাগলো তাঁর মুখে। "তোমরা অনশনের কথা ভাবছো; অন্ততঃ একথা আমায় জানাবে তো?" বললেন। "কিন্তু কেউ এ বিষয়ে জানতো না। বাপু তাঁর সিদ্ধান্তের কথা একটা চিঠিতে আজ ভোরে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তর্কের কোন পথই তিনি রাখেন নি," জবাব দিলাম।

দ্বিতীয় শব্দটি আর না করে নিজের পাচিকাকে ডেকে পাঠালেন। বলে দিলেন তাঁর জন্য যেন খাওয়া তৈরী না করা হয়। "যতদিন গান্ধীজীর অনশন চলবে ততদিন আমি দিনে একবার খাবো এবং তাও হবে ফল ও দুধ।" বললেন তাকে। গান্ধীজীর সকল অনশনেই তাঁর এই কার্যক্রম চলে এসেছে। এতে স্বামীকে সেবা করবার জন্য যে শক্তি তা রক্ষা পেতো, সে সঙ্গে তাঁর দুঃখের ভাগ ও নিতে পারতেন।

অনশনের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে 'বা' হঠাৎ রাষ্ট্রীয়শালায় যেখানে গান্ধীজি অনশনে ছিলেন সেখানে এসে গান্ধীজীর সামনে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি করে এলে?" 'বা' বললেন যে সরকার তাঁর কাছে বলে পাঠিয়েছে ইচ্ছে করলে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন। সেই অনুমতিতেই তিনি আসতে পেরেছেন। সরকারী যে গাড়ী 'বা'কে নিয়ে এসেছিল, পৌঁছে দিয়ে তা চলে যায়; রাত পর্যন্ত কেউ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এলো না। এ ভাবে তাঁকে পরোক্ষ মুক্তি দেবার কথা সরকার নিশ্চিত চিন্তা করেছে, কিন্তু গান্ধীজি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। "যদি সরকার 'বা'কে মুক্তি দিতে চায় সোজাসুজি পথে তা করতে পারে এবং 'বা'র সঙ্গিনী মণি ও মৃদুলাকেও সঙ্গে মুক্তি দিতে পারে," —তিনি বললেন। 'বা'কে রাত দশটার সময় বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন। একজন কেউ মন্তব্য করলেন যে বিশেষ অনুমতি পত্র না

পেলে প্রাইভেট গাড়ীতে বন্দী শিবিরের পথে যেতে দেওয়া হয় না। বাপু 'বা'র দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—"যদি তারা তোমার গাড়ী আটক করে তুমি সত্যাগ্রহ করবে, ফিরে আসতে অস্বীকার করবে। দরকার মনে করলে রাস্তার ধারে রাত কাটাবে।" 'বা' নিঃশব্দে সে আজ্ঞা পালন করলেন। সে সময়ে তাঁর মনের মধ্যে কি যেন হচ্ছিল! স্বামী যখন অনশনে সে সময়ে তাঁকে ছেড়ে যাওয়া 'বা'র পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। গান্ধীজী সরকারের কাছে সমস্ত অবস্থাটি বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখলেন। সরকার রাস্তায় 'বা'কে রাত কাটাতে দেবার সাহস আর পেল না। বন্দী শিবিরে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো এবং পরদিন তিনি ও তাঁর সঙ্গিনী দু'জন মুক্তি পেলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। বিকাল ৩টার মধ্যে তাঁরা বাপুর কাছে ফিরে এলেন। সেদিন গান্ধীজির অবস্থা কিছু উদ্বেগের হওয়ায় নিজের শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্ত শরীরের কথা ভুলে তাঁর সেবায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।



॥ অসুস্থতা ও তারপর ॥

অনশন ত্যাগের অল্প পরে রাজকোট থেকে গান্ধীজীকে কোলকাতা ফিরে যেতে হলো এবং সেখান থেকে গেলেন বিহারের বৃন্দাবনে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। বৃন্দাবন থেকে একদিন কি দুদিনের জন্য দিল্লীতে যাত্রা ভঙ্গ করে রাজকোট ফিরে গেলেন। দিল্লীতে থাকার সময় 'বা' কাঁপুনিসহ জ্বরাক্রান্ত হলেন।

আমি বললাম ঐ অবস্থায় তাঁকে ঘোরানো ঠিক হবে না। কিন্তু বাপুর মত হলো যদি তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেন তাহলে 'বা' আরামের সঙ্গে যেতে পারবেন। তাই তিনি তাঁকে সঙ্গে নিলেন। ট্রেনে 'বা'র উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেনের মধ্যে আমার পক্ষে যত্ন ও চিকিৎসা যতদূর করা সম্ভব, করলাম। 'বা'র কোনদিকে খেয়াল ছিল না। বাপুর কাছে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ,—এ বিশ্বাস তাঁর অটুট। রাজকোটে পৌঁছলাম এবং উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসার ফলে তাঁর জ্বর নেমে এলো। কয়েক দিন পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাবার পথে বম্বে এলেন। অসুস্থ শরীরে ট্রেনে দীর্ঘপথ যাতায়াতে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হয়ে গেল। আমাকে সেবাগ্রাম যেতে হয়েছিল। গান্ধীজি 'তার' পাঠালেন শীঘ্র তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। বম্বে এসে দেখলাম 'বা' অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু শক্তি ফিরে পাবার আশ্চর্য যোগ্যতা দেখালেন। চিকিৎসার ফল ভালো হলো এবং জ্বর থামবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিকে রওনা হলেন। 'বা' সঙ্গে যেতে চাইলেন কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল থাকায় ঠিক হলো আট কি দশদিন পরে তিনি গান্ধীজিকে অনুসরণ করবেন।

আমার চিকিৎসা বিষয়ক যোগ্যতা সম্বন্ধে 'বা'র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর ভালবাসা এবং সরল বিশ্বাস আমাকে 'পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট' পর্যন্ত পড়াশুনা করে চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রেরণা জোগাল।

সীমান্ত প্রদেশ থেকে ফিরবার পথে আমি দিল্লীতে থামলাম 'পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট' পড়াশুনা ও ডাক্তারী শাস্ত্রে ডক্টরেট নেবার জন্য। যখন 'থিসিস্' প্রস্তুত করার জন্য খুব খাটছিলাম, সে সময়ে বাপুর টেলিগ্রাম পেলাম যে 'বা' অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসতে চান। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম পাঠালাম এই বলে যে 'বা'র

জন্য যে কোন কিছু করার জন্য খুশী মনে প্রস্তুত। 'বা' একলাই দিল্লী এলেন। মহাদেব ভাইকে লিখলাম, এই বয়সে এবং শরীরেব এই অবস্থায় 'বা'কে একা পাঠানো ভুল কাজ হয়েছে। উত্তরে মহাদেব ভাই লিখলেন যে বাপুব পরামর্শেই তিনি ওকাজ করেছেন। আমি বলি, বাপু ভুল করেছেন। 'বা' আমাকে বকুনি দিলেন। বললেন, "চায়ের কাপে তুফান তুলছো অনর্থক। আসবাব পথ সোজাই ছিল। মহাদেব ওয়ার্ধায় আমাকে ট্রেনে তুলে দেয় এবং সঙ্গী সাথীদের বলে দেয় আমাকে দেখবার জন্য। এখানে তোমরা সকলে আমাকে নিতে এসেছিলে স্টেশনে। চিন্তা করবার মত আর রইলো কি? ট্রেনের মধ্যে আমাকে শুধু বসে থাকতে হয়েছিল। তার জন্য আমার আবার সঙ্গীর কি দরকার ছিল?"

'বা' তাঁর ছেলে দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন, আমি দিনের বেলায় তাঁকে দেখবার জন্য দু'তিনবার যেতাম। তাঁর আসবার পরেই আমার ইষ্টারের ছুটি হয়। আগে থেকেই পরিকল্পনা করেছিলাম যে ইষ্টারের ছুটিতে বম্বে যাবো এবং সেখানকার হাসপাতালগুলিতে গুটিকয়েক বিশেষ রোগী দেখে আসবো। ইষ্টারের সময় সেবাগ্রাম যাবার জন্য গান্ধীজি আমাকে বলেছিলেন অথচ 'বা' দিল্লীতে এসেছেন শুধুমাত্র আমার চিকিৎসাধীনে থাকবেন বলে। তাঁকে ফেলে আমি কেমন করে যাই? 'বা' খুব উদার ছিলেন। তিনি বললেন ছুটির সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বাইরে যেতে। "তুমি সেবাগ্রাম যেতে পার, আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো।" কিন্তু তাঁকে ফেলে যেতে আমার হৃদয় নারাজ। বাপুর কাছে তার পাঠালাম আমাকে যেন মাফ করেন। বম্বে যাবার প্রোগ্রামও বাতিল করে দিলাম। আমার কাছে কিছুদিন থাকতে চাইলেন 'বা'। "তুমি সকাল সন্ধ্যা আমার কাছে প্রার্থনা

করো তাহলে আমার মনে হবে যেন আশ্রমে রয়েছি,"—বললেন। আমি হাসপাতালে আমার ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে।

তাঁর অসুখ গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হলো সে সঙ্গে আগেকার বি-কোলাই দেখা দিল। আমি ভয়ঙ্কর চিন্তায় পড়লাম। আমার জন্যই তিনি দিল্লী এসেছিলেন। এখন সেরে না উঠলে বাপুর কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে? তাঁকে আবার শ্রীদেবদাস গান্ধীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। ঈশ্বর কৃপাময়,—উপযুক্ত চিকিৎসায় তিনি সেরে উঠতে লাগলেন। অবস্থা কেমন জানতে চেয়ে বাপু তারের পর তার পাঠাচ্ছিলেন। প্রত্যেকদিন স্নেহেভরা চিঠি লিখতেন তিনি 'বা'র কাছে। আমার কলেজের ঠিকানাতেই সাধারণতঃ সেগুলো আসতো। চিঠিগুলো যখন নিয়ে যেতাম 'বা' উল্লসিত হয়ে উঠতেন। সেগুলো প্রথমে একবার পড়ে নিয়ে বালিশের তলায় রেখে দিতেন। তারপর চোখে চশমা লাগিয়ে বহুবার সেগুলো পড়তেন প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা করে করে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ঐ সকল চিঠি তাঁর আরোগ্য লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। যখন বেশ শক্ত হয়ে উঠলেন, দেবদাস গান্ধী তাঁর পুরো পরিবারসহ তাঁকে নিয়ে সেবাগ্রাম গেলেন। স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেয়েছিলেন যদিও সামান্য দুর্বলতা ছিল।

১৯৪২, আগস্টে আমি লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজে কাজ করছিলাম। মে মাসের শেষে পরীক্ষা পাশ করি কিন্তু রেজিষ্ট্রার হিসাবে আমার কার্যকাল আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাড়ে। ৪ঠা ৫ই আগষ্ট আমার বন্ধু দিল্লীর এক সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকে জানতে পারি খুব সম্ভব সেবাগ্রাম ফিরবার আগেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হবে। সেজন্য আমি লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজের

অধ্যক্ষের কাছ থেকে ছুটি নিই বম্বে গিয়ে দাদা এবং গান্ধীজীকে দেখবার জন্য। ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় বম্বে পৌছাই। দাদা ও গান্ধীজী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিঙে গিয়েছিলেন। 'বা' বিড়লা হাউসেই স্বামীর জন্য কোন না কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গান্ধীজীর বিখ্যাত ৮ই আগষ্টের বক্তৃতা শুনবার জন্য আমি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে পৌছি। আমাকে দেখে সকলেই বিস্মিত। আমার আসবার কারণ শুনে ভীতু বলে আমায় ঠাট্টা করল। প্রায় ১১টার সময় জনসভা থেকে ফিরে এলাম। গান্ধীজী তারপরও প্রার্থনায় যোগ দিলেন। 'বা' তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এবং আমরা সকলেই গান্ধীজীকে শোয়া পর্যন্ত দেখে রাত ১২টার পর শুতে গেলাম।

ভোরের প্রার্থনার জন্য নিয়মমাফিক ৪টায় জাগলাম। মহাদেব ভাই গান্ধীজীকে বললেন, রাত ১টা পর্যন্ত টেলিফোনে বন্ধু বন্ধুবান্ধব তাঁকে জানিয়েছেন যে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ আসছে। সকাল সাড়ে ৫টায় মহাদেব ভাই গান্ধীজীর ঘরে ছুটে এলেন। "বাপু, ওরা এসেছে," কম্পিত গলায় বললেন। বাপু অবিচলিত ভাবেই খবরটি গ্রহণ করলেন। পুলিস অফিসারেরা আধ ঘণ্টা সময় দিলেন। যে কয়েকটি জিনিস সঙ্গে নেবার ইচ্ছে হলো তাড়াতাড়ি তা গুছিয়ে নিলেন। আমরা সামান্যক্ষণ প্রার্থনার জন্য বসলাম। মহাদেবভাই গান আরম্ভ করলেন,

"হরিনে ভজতাং হজী কয়োনী লাজ জতাং নথী জানীরে"

(ঈশ্বরের নাম যাঁরা নেন তাঁরা কখনো অসম্মানিত হতে জানেন না)।

পুলিশ বাপু, মহাদেবভাই ও মীরাবেনের গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বললে যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার

দাদা এবং 'বা' সঙ্গী হতে পারেন বাপুর। 'বা'কে ডাকলেন বাপু। বললেন, "যদি আমাকে ছেড়ে থাকতে না পার, সঙ্গে আসতে পাব। কিন্তু আমি বরং চাই তুমি ও প্যারেলাল পেছনেই থাক এবং আমার কাজ কর।" এ কথাই 'বা'র পক্ষে যথেষ্ট। কোন রকম যুক্তিতর্ক না করেই তিনি থেকে যাওয়াই স্থিব করলেন। বাপু, মহাদেবভাই ও মীরাবেনকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। তখন সকাল ৬টা।

৭

॥ গ্রেফতার ॥

'বা' অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তার তাঁর কাছে তীব্র আঘাত হয়ে বাজলো। এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

সেদিনই সন্ধ্যায় বাপুব শিবাজী পার্কে এক জনসভায় ভাষণ দেবাব কথা। 'বা' জানালেন তিনিই বক্তৃতা দেবেন বাপুর পরিবর্তে। জনসাধারণ একথা শুনে আনন্দে উত্তেজিত হলো। সরকারও এ সম্বন্ধে জানতো পারলো। আমরা খবর পেলাম জনসভায় যাবার পথেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। এ রকম দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে কারাগারে যেতে দেওয়া চলতে পারে না, বিড়লা হাউসে যে সব বন্ধুবান্ধবেরা ছিলেন সকলেই সেই মত প্রকাশ করলেন। বিড়লা হাউসেই গান্ধীজীর সঙ্গে 'বা' বাস করছিলেন। একজন ডাক্তার হিসাবে আমাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বিবেচনা করা হল। সুতরাং আমি আমার এবং 'বা'র দরকারী জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে

নিলাম। তারপর 'বা' দুটি বাণী আমাকে বললেন লিখে দিতে,—একটি মহিলাদের জন্য অন্যটি সাধারণভাবে সর্বভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। একটুও না থেমে তিনি বলে গেলেন। তাঁর ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার, বিনা চেষ্টাতেই ঠিক ঠিক শব্দ বের হলো তাঁর মুখ থেকে। মহিলাদের প্রতি বাণীতে তিনি লিখলেন "গান্ধীজী গতরাত্রে আড়াই ঘণ্টা ধরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় আপনাদের কাছে তাঁর হৃদয়কে ঢেলে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আর কিছু যোগ করার নেই। আমাদের কাছে অবশিষ্ট রইল যা, তা হলো তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। ভারতীয় নারীদের সাহসিকতা প্রমাণিত করতে হবে। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁদের সকলেরই এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া দরকার। সত্য ও অহিংসাই হবে আমাদের পথ-নির্দেশক।"

বিকাল পৌণে ৫টায় 'বা' ও আমি জনসভায় যাবার জন্য বেরোলাম। দরজার গোড়ায় একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি 'বা'কে অনুরোধ করলেন, "মা, এসব কাজের পক্ষে আপনার বয়স অনেক বেশী। আপনার এই বয়সে বাড়ীতে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। অনুগ্রহ করে জনসভায় যাবেন না।" সমস্ত জিনিসটাকেই মনে হলো হাস্যকর। 'বা' গাড়ীতে উঠবার জন্য এগোলেন। আমিও অনুসরণ করলাম তাঁকে। অতএব পুলিশ অফিসার আমাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করলেন, কারণ তিনি জানতেন 'বা' যদি গ্রেফ্‌তার হন তবে আমি সভায় ভাষণ দেবো।

গান্ধীজীর শেষ নির্দেশ ছিল, প্রত্যেক অহিংস সৈনিক, যাঁরা অহিংসা-অস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছেন তাদের প্রত্যেকেই 'ব্যাজ' ধারণ করবে যাতে লেখা থাকবে সেই নীতি বাক্য 'করবো না হয় মরবো' (করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে)। যাঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী নন

তাদের থেকে বিশ্বাসীদের পৃথক কররার জন্যই এ ব্যবস্থা। কাম্মু গান্ধী এই মন্ত্র কাগজের টুকরায় লিখলেন এবং আমাদের হাতে দিলেন। 'বা'কে যখন দেওয়া হ'ল তিনি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "এর দরকার কি ?" মন্ত্র তাঁর হৃদয়ের মধ্যে ছিল এবং তিনি সকল সময়েই তাকে অনুসরণ করেছেন জীবনে। বাইরের আলাদা কোন প্রতীকের তাঁর দরকার নেই।

সভায় যে গাড়ী আমাদের নিয়ে যাবে, পুলিশ সেটা অধিকার করে নিয়ে 'কয়েদী গাড়ী' রূপে ব্যবহার করলো আর্থার রোডের কারাবাসে 'বা', দাদা ও আমায় নিয়ে যাবার জন্য। বেদনা এবং শ্রান্তিতে 'বা'র মুখখানাকে মনে হলো ঝুলে পড়া ও শ্রীহীন। তাঁর চোখে ছিল জল। "কিসের জন্য দুঃখ পাচ্ছেন 'বা' ?" জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিলেন না। তাঁর হাত নিলাম আমার হাতে, গরম হাত। জ্বর। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। "ওরা এবার আমাদের আর বেঁচে থাকতে দেবে না," বললেন অবশেষে। "দেখতে পাচ্ছ না এই সরকার শয়তানের প্রতিমূর্তি ?" "হ্যাঁ, 'বা', ওরা শয়তান, কিন্তু ওদের দুষ্ট প্রকৃতি ওদেরই পতনের কারণ হবে এবং বাপু জয়ী হয়ে ফিরবেন,"—তাঁকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম।

গাড়ী বম্বের আর্থার রোড কারাবাসের সামনে থামলো।

ফটক খোলা হল। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল অফিসে। মহিলা বিভাগের মেট্রন এলেন একটু পরে। আমাকে ও 'বা' কে ভেতরে নিয়ে গেলেন। দুটি অদ্ভুত ধরণের লোহার ফ্রেম আমাদের কামরায় আনা হলো। তার উপর লম্বা কাঠের তক্তা জুড়ে দিয়ে বলা হলো এইগুলি শোবার খাট এবং একমাত্র প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই এ খাটের ব্যবস্থা। নারকেল ছোবরার তোষক ও কিছু নোংরা ধরণের চাদর দিলো। চাদরগুলো ফিরিয়ে

দিলাম কিন্তু তোষক রাখলাম। 'বা'র পক্ষে তক্তার খাট শক্ত হবে কারণ তাঁর তোষক ছিল পাতলা। আমি কারাগারের দেওয়া তোষকের উপর তার বিছানা পেতে শুইয়ে দিলাম। তাঁর জ্বর তখন ৯৯.৬ ডিগ্রী। অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি, কোন কিছুই খেতে চাইলেন না। শীঘ্রই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন।



॥ কারাগৃহে ॥

রাত প্রায় ২টার সময় জেগে উঠলাম। দেখি 'বা' পায়খানা থেকে ফিবছেন। পাগুলো যেন টলছে। ঝট্ করে উঠে তাঁকে ধরে ফেললাম। বিছানায় শুইয়ে দেবার পর জানলাম, সারারাত ধরে তিনি পেটের গোলমালে (ডায়েরিয়া) ভুগছেন। আমি অসম্ভব ক্লান্ত ছিলাম বলে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ি। 'বা'র দয়ালু অন্তর আমাকে জাগাতে চায়নি। শুনে খুবই খারাপ লাগলো।

সকালবেলা তদারকীর জন্য কারা-ডাক্তার আমাদের ব্লকে এলেন। 'বা'র জন্য পৃথক খাবার দেবার কথা বললাম। কারা বিভাগ এসব জিনিস দিতে পারবে না, যা দরকার তা কিনে নিতে বললেন। আমি সঙ্গে কোন টাকা আনিনি, 'বা'ও আনেন নি কিছু। তাই ডাক্তারকে বললাম সহরে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের টেলিফোন করে কিছু টাকা আনাতে। তাও সম্ভব হলো না।

কারাধ্যক্ষ বললেন, "এবারের অবস্থা অন্যবারের মত নয়। আমাদের উপর নির্দেশ আছে বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সংযোগই যেন আপনাদের করতে দেওয়া না হয়।" অত্যন্ত বিশ্রী

অবস্থায় পড়লাম। ডাক্তারবাবুকে বললাম, "এ অবস্থায় যা যা দরকার ডাক্তারখানা থেকে তা পাঠানো একান্ত উচিত। বাইরের হাসপাতালে আমাদের রোগীদের জন্য বিশেষ খাবারের কথা ডাক্তার হিসাবে কর্তৃপক্ষকে জানাবার নিয়ম আছে। মনে হয় এখানেও আপনারা সে নিয়ম পালন করতে পারেন। যদি না পারেন আমি অনুরোধ করবো নিজের পকেট থেকে খরচ করে জিনিসপত্র কিনে আনবার জন্য। যখন সময় আসবে সে টাকা আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।" আমি ও একজন ডাক্তার, বুঝতে পেরে কারা-ডাক্তার একটু নরম হলেন এবং ওষুধ-পত্তর ও কিছু আপেল পাঠাবেন কথা দিলেন। আপেলের রসের উপর 'বা'কে জীইয়ে রাখতে হবে ঠিক করে নিলাম। সারাদিনে বহুবার জিজ্ঞাসাবাদের পর বেলা শেষে ছুটি আপেল এলো। ছুটি আপেল থেকে কতটুকু রস নিংড়ে নিতে পারবো? আর শুধু মাত্র হাতে তা-ই বা কি করে সম্ভব? কোন ঔষধই এলোনা। এরমধ্যে 'বা'র পাত্‌লা পায়খানা কমতে সুরু করে এবং শরীরের তাপ ও কম। তিনি নির্জীব হয়ে পড়ছিলেন। আমি বিপদাশঙ্কায় অত্যন্ত মুষড়ে পড়ছিলাম।

'বা'কে অস্থির এবং অসুখী দেখাচ্ছিল। ছুতিনবার চেষ্টা করলাম কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখতে, কিন্তু তা ব্যর্থ হলো। যে ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা রুদ্ধ। ছুর্গন্ধে ভরা। আকাশ-বোমা থেকে বাঁচাবার জন্য বারান্দার সামনে যে উঁচু দেওয়াল তৈরী করা হয় তাতে খোলা হাওয়া ঢুকবার কোন উপায় ছিল না এবং ফাটা নর্দ্দমা দিয়ে পচা গন্ধ ঢুকছিল। কামরাটি ভিজা, প্রায় অন্ধকার। ওখানে বসে বসে ছু'জনেরই মাথাধরা আরম্ভ হল।

মেট্রনের দয়া হলো। বললেন আমরা বাইরে এসে তার কাছে তার বারান্দায় বসতে পারি। 'বা'র বিছানা বয়ে সেখানে নিয়ে

এলাম। তিনি সামান্য সময়ের জন্য হলেও বিশ্রাম পেলেন। কিন্তু সেখানে কোন পায়খানা ছিল না। আমাদের কামরায় বারবার যাওয়া আসা 'বা'র দুর্বল শরীরের পক্ষে আরও কষ্টের; তাই আমি তাঁকে আবার কামরায় নিয়ে এলাম। মেট্রনের বারান্দায় আমাকে ফিরে যাবার জন্য 'বা' জোর করতে লাগলেন। তাঁকে খুশী করার জন্য কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এর মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। আর একজন মহিলা কয়েদী, শ্রীমতী শীতল দাস আমাদের কামরায় এলেন সঙ্গী হিসাবে। তিনি তিন চারটি শিশুর মা, কনিষ্ঠটি বছর দুয়েকের এবং তাও অসুস্থ। তাঁর দিকে তাকিয়ে 'বা' নিজের দুঃখ ভুলে গেলেন। তিনি মধুর ভাবে তাঁর ছেলেমেয়েদের ও পরিবারের খোঁজ খবর নিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

তিনি ভারতেব কোটি কোটি লোকের 'বা' (মা) হয়ে দাঁড়ালেন। কোটি কোটি জনসাধারণ যখন আগুনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন ব্যক্তিগত যন্ত্রণাভোগ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁর দুঃখ দুর্দশা কোন স্বার্থলাভের জন্য ছিল না। 'বাপু ভারতের কোটি কোটি মানুষের দুঃখকে দূর করতে সমর্থ হবেন তো।'—এই প্রশ্নই মনের মধ্যে মুখ্য হয়েছিল। যদি ব্যর্থ হন? এই চিন্তাই তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম, "আপনি দুশ্চিন্তা করছেন 'বা'? বাপু যা কিছু করেছেন, সবটুকুই করেছেন পবিত্র নিষ্ঠাভরে। তিনি কারো উপর নির্ভর করেন না, করেন ঈশ্বরের উপর। ঈশ্বর তাঁর এই মহান কাজে নিশ্চয়ই সফলতা আনবেন।" 'বা' চুপ করলেন। কোটি জনসাধারণের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে তাঁর চির সবুজ বিশ্বাস চলে যেতো। তাঁর চোখে এবং বিশীর্ণ মুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ পড়তো।

প্রথমদিন 'বা' ও আমি খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে আবিষ্কার করলাম রাত্রিবেলা আমাদের তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাই দ্বিতীয় দিনে নূতন সঙ্গিনীকেও নিয়ে আমরা আমাদের বিছানা নিয়ে এলাম বারান্দায়। তালাবন্ধ অবস্থায় থাকবোনা স্থির করলাম। মেট্রন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে কারাধ্যক্ষের কাছে গেলেন। কারাধ্যক্ষ তাকে নীরব থাকতে বললেন। তিনি জানতেন যে রাত্রিবেলা সেখানে আমাদের কাটাতে হবে না।

কামরার চেয়ে অনেক বেশী খোলা হাওয়া ছিল বারান্দায়। প্রতিবন্ধক দেওয়াল থাকলে ও নিঃশ্বাস রোধকারী দুর্গন্ধ ছিল না। 'বা' অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন এবং শুতে চলে গেলেন। শ্রীমতী শীতল দাস ও আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলাম। 'হরিজন' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি তিনি এনেছিলেন। আমি গোগ্রাসে গিলবার মত করে তা পড়ি। সান্ধ্য-প্রার্থনার জন্য 'বা' কখন জাগবেন আমরা ছিলাম তারই অপেক্ষায়। কিন্তু তিনি জাগলেন না। রাত ৯টার সময় মেট্রন এসে বললেন ১১টায় আমাকে ও 'বা' কে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বিছানাপত্রসহ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, 'বা'কে যতক্ষণ পারেন ঘুমাতে দিলাম। সমস্ত কিছু গোছগাছ করার পর তাঁকে জাগালাম এবং প্রার্থনায় বসলাম। প্রার্থনার শেষে রামধুন গাইলাম। সে সময় কারা-কর্তৃপক্ষ ও তাঁর লোকজনেরা হাজির হলেন।

'বা'র খাদ্য তালিকা সম্বন্ধে ডাক্তারের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা আমার হয়েছিল তার গল্প শ্রীমতী শীতল দাস শুনেছিলেন। তাঁর টাকার থলিটি আমার হাতে দিয়ে আমার যা দরকার তা নিয়ে নিতে বললেন। থলির মধ্যে ২০ টাকার মত ছিল। আমি পাঁচ টাকার একখানা নোট তুলে নিলাম। পরিবর্তে আমার একখানা রঙীন

শাড়ী নিতে বাধ্য করলাম। রঙীন কোন শাড়ী আনতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। অন্তরের গভীরে একটা স্বস্তির শান্তি অনুভব কবলাম। "যা হোক, যদি জেলে মরিও, ঋণ রেখে যাব না," বললাম মনে মনে। দুবছব পব আগাখাঁ প্রাসাদের বন্দী-শিবির থেকে মুক্ত হবার পর বম্বেতে মহিলাব. সঙ্গে আমাব দেখা হয়। 'বা' তখন আব ইহলোকে ছিলেন না। যে পাঁচটি টাকা ধার নিয়েছিলাম তা ফিবিয়ে নেবাব জন্য জোর কবলাম। কিন্তু শ্রীমতী শীতল দাস তা নিলেন না। সে টাকা অবশেষে হরিজন ফাণ্ডে যায়।

কাবা—তত্ত্বাবধায়ক আমাদেব মালপত্র আনিয়ে নেন। তাঁকে অনুসবণ করে তাঁব অফিসে পেঁছাই। 'বা' জিজ্ঞেস করলেন, —"আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? যাববাদা না বাপুর কাছে?" মেট্রনকেও সে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। সম্ভবতঃ বেচাবী ভদ্রমহিলা নিজেও জানতেন না। ভাবলাম জেল-সুপাবও (কারা—তত্বাবধায়ক) স্পষ্ট জবাব দেবেন না। কিন্তু দিলেন। "আপনাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাপুজীর কাছে,—"এই উত্তব আমাদের দুজনকেই মহা স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলতে দিল।

স্টেশনে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো এবং বিশ্রাম কক্ষে বসিয়ে বাখা হলো। আমার ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু 'বা' সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। স্টেশনে হট্টগোল চলছিল যথারীতি! ট্রেন এলো, গেলো, লোকজনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। ধূমপানে রত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন,— যাত্রীদের সঙ্গে কুলিদের বচসা শোনা গেল। 'বা' সমস্ত কিছুই হুশিয়ারী ভাবে লক্ষ্য রাখছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, "সুশীলা দেখ, পৃথিবী চলছে যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। বাপুজী কি করে স্বরাজ আনবেন?" এই প্রশ্নে এবং গলার স্বরে এত

বেদনা জড়িয়ে ছিল যে আমি বিচলিত হ'লাম। "'বা', ভগবান বাপুজীকে সাহায্য করবেন এবং সবই শুভ হবে,"—শান্ত সুরে জবাব দিলাম!

পুলিশ কর্মচারীরা আমাদের কথায় বাধা দিলেন। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। একটি প্রথম শ্রেণীর 'কুপে'তে আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হলো। ট্রেন চললো পুণার পথে।

৯

॥ আগা খাঁ প্রাসাদ ॥

সকাল ৭টার সময় ট্রেন থামলো একটি ছোট স্টেশনে। একজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের নেবার জন্য। সারারাত ধরে পেটের অসুখে 'বা' অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। পুলিশ কর্মচারীটি একখানা চেয়ার তৈরী রাখলেন তাঁকে বাইরে আনবার জন্য। কিন্তু তিনি তাতে বসতে রাজী হলেন না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বেশিদূর হাটতে হলো না! গাড়ী পর্যন্ত হেটে পৌঁছাতে একমিনিট বা দু মিনিটের বেশী লাগলো না। আর আধঘণ্টার মধ্যে আমরা আগা খাঁ প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে পড়লাম। সামরিক পাহারাদার (গার্ড) লোহার প্রকাণ্ড ফটক খুলে দিল, মোটর গাড়ী তার মধ্যে গড়িয়ে ঢুকলো। বাইরের ফটকের পঞ্চাশ গজের মধ্যে আমাদের আবার থামতে হলো। কারণ ভিতরে থাকা সম্মানিত বন্দীদের সম্মানে কাঁটতারের আর একটি বেড়া নূতন করে দেওয়া হয়েছে সেখানে। কাঁটাতারের ফটকটিও সামরিক পাহারাদার খুলে দিল, গাড়ী ভিতরে ঢুকে গাড়ী-

বারান্দার নিচে থামলো। আমার সহায়তায় 'বা' সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠলেন। কয়েকজন কয়েদী বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছিল। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম বাপুর ঘর কোনটি। সে বললে সারির শেষ কামরাখানাই বাপুর। 'বা' আস্তে আস্তে হেটে বাপুর ঘরে গেলেন, আমি ধরে ধরে নিয়ে গেলাম। একটি কৌচের উপর পাতা বিছানার উপর বাপু বসে আছেন দেখলাম। তাঁর হাতে একটি পেন্সিল ছিল, একটা মুসাবিদা আবার ফিরে দেখছিলেন। মহাদেব ভাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, দুজনে কিছু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের পাশে গিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমাদের দেখতে পান নি। মহাদেব ভাইই আমাদের দেখতে পান প্রথমে এবং আনন্দে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু বাপুর মুখখানা কালো হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন 'বা'র শরীরের অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেছে এবং সেজন্যই 'বাপু'র কাছ থেকে দূরে থাকা সহ্য করতে পারেন নি। সেজন্যই সরকারকে অনুরোধ করেছেন বাপুর কাছে পাঠাতে। ভাবপ্রবণতার কাছে কর্তব্যকে বলি দেবার কথা তিনি সহ্য করতে পারেন না। প্রায় কড়া ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন "তোমাকে এখানে পাঠাবার জন্য সরকারকে নিজে অনুরোধ করেছিলে না তারা নিজেরাই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে!" 'বা' বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর্যন্ত বাপু কি প্রশ্ন করছেন তাও মাথায় নিতে পারলেন না। তাঁর হয়ে আমি জবাব দিলাম, "বাপু, আমাদের বন্দী করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।" এখন 'বা' বুঝতে পারলেন বাপু কি জিজ্ঞেস করছেন। বললেন, "না, না, আমি অনুরোধ করিনি। সরকার আমাদের গ্রেফ্‌তার করে এখানে নিয়ে এসেছে।" ঠিক সে সময়ে পুলিশ অফিসার এলেন এবং আমাদের মালপত্র দেখে নিতে বললেন।

গাড়ী-বারান্দা পর্যন্ত আবার 'বা' হেটে যান আমি তা চাইলাম না, কিন্তু যাবেন বলে তিনি জিদ ধরলেন! সমস্ত জীবন ধরেই তিনি অত্যন্ত গোছালো ও কর্মঠ। তা ছাড়া বাপুর কাছে আবার ফিরে আসতে পারায় মনে হল সঞ্জীবীত হলেন। 'বা' সুস্থ নন শুনে, মহাদেবভাই বিছানা তৈরী করতে লেগে গেলেন। মালপত্র পরীক্ষা করে গাড়ী-বারান্দা থেকে ফিরবার পথে আমাদের নূতন জেল-সুপার শ্রীযুত্ কাটেলীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি জানতেন না যে আমরা এরই মধ্যে বাপুর ঘরে গিয়েছি। খুব শ্রদ্ধা ও মনোযোগর সঙ্গে তিনি 'বা'কে বাপুর ঘর পর্যন্ত আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা 'বা' কে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আমি যে ব্যবস্থাপত্র লিখলাম তা সাইকেল আরোহীকে দিয়ে তক্ষুনি ওষধের দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু 'বা'র পেটের অসুখ ছিল স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য। বাপুর সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে ওষুধের কাজ করে। তাই একমাত্রা ঔষধ দিতেই পেটের গোলমাল বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন 'বা' বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং বাপুর ছোটখাট কাজ করতে আরম্ভ করলেন। আগা খাঁ প্রাসাদে সে সময়ে মাছি মশা ও অন্যান্য ছোটখাট পোকা ইত্যাদি উপদ্রব সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ গাত্র-মর্দনের সময় গান্ধীজি ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু এখানে ঘুমানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো যদি অপর কেউ একজন পোকা দূর না করে। সুরুতে একদিন দুদিন মহাদেবভাই সেকাজ করেন। তারপর 'বা' সেকাজ হাতে নেবার মত সুস্থবোধ করলেন। গাত্র-মর্দনের সমস্ত সময়টুকু তিনি পাখা হাতে আরাম কেদারায় বসতেন, হাত তার সারাক্ষণ এদিক ওদিক নড়তো যেন মেশিন।

৯ই আগষ্ট রবিবার বাপুকে আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দী শিবিরে নিয়ে আসা হয়। 'বা' ও আমি সেখানে পৌঁছাই মঙ্গলবার সকালে।

১৪ই আগষ্ট শুক্রবার দিন 'বা' বেশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাড়ীময় হেঁটে বেড়ান, রান্নাঘরে উকি দেন, প্রার্থণায় অনেকক্ষণ থাকেন এবং ধর্মগ্রন্থ পড়ে সময় কাটান। আমরা একটি সুখী পরিবার তখন এবং সময় যেন হাওয়ায় ভেসে উড়লো।

১০

॥ মহাদেব ভাইয়ের মৃত্যু ॥

শনিবার ১৫ই আগষ্ট, বাপু সকাল সাড়ে সাতটায় প্রাতঃভ্রমণের জন্য বাগানে যান অভ্যাস মাফিক। হাঁটবার সময় মহাদেবভাইও যোগ দেন এবং নানা বিষয়ে কথাবার্তা সুরু করেন। আকস্মিক-মৃত্যু সম্বন্ধেও কথা হয়। আমরা বেড়িয়ে ফিরলাম ৮টায়। বাপু—গাত্র মর্দন টেবিলের দিকে আর মহাদেবভাই তাঁর ঘরের দিকে গেলেন। সেদিন সকালে 'বা' পাখা হাতে এলেন না। শ্রীমতী নাইডু গান্ধীজীর দলের সঙ্গে এখানকার বন্দী শিবিরে ছিলেন। 'বা' শ্রীমতী নাইডুর কাছে গিয়েছিলেন। কারাগৃহের সর্বোচ্চ পরিদর্শক কর্ণেল ভাণ্ডারী আমাদের বন্দী শিবির পরীক্ষায় আসবেন, তাই কয়েদীরা সকলেই ঘর বারান্দা ইত্যাদি ঝাড়-পোছ করায় ব্যস্ত ছিল। শ্রীমতী নাইডু নিজের কামরায় ফুল সাজাতে ছিলেন ব্যস্ত। কর্ণেল ভাণ্ডারীর মোটরগাড়ী আসবার শব্দ শোনা গেল। তিনি এসে শ্রীমতী নাইডুর কামরায় গেলেন। বাপু ও আমি ছাড়া অন্যান্য সকলেই সে কামরায় ভাণ্ডারীর সঙ্গে দেখা করতে যান। আমি বাপুজীর শরীর 'ম্যাসাজ' (গাত্র মর্দন) করছিলাম। বারান্দায় গাত্র-মর্দন-টেবিলের কাছ থেকেই শ্রীমতী

নাইডুর ঘরের সকলের কথাবার্তা, হাসি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। মহাদেব ভাইয়ের গলা পরিষ্কার শুনছিলাম। হঠাৎ হাসিটা থেমে গেল। কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলেন। ভাবলাম কারা-পরিদর্শকের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য ডাকা হচ্ছে। ঠিক সে মুহূর্তেই 'বা' ছুটে এলেন, "সুশীলা, শিগ্‌গির এসো; মহাদেবভাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।" বললেন হাঁপাতে হাঁপাতে। দৌড়ে গেলাম। মহাদেবভাই শেষ যাত্রার জন্য তৈরী হয়েছেন। নাড়ী নেই। নিঃশ্বাস ভারী ও কষ্টকর। যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ সেইসঙ্গে। মুখ মোচড় খাওয়া। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খিচুনি শুরু হয়েছে।

বাপুকে ডাকতে পাঠালাম। তিনিও ভাবলেন কারা-পরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাতই এর কারণ। কে একজন তাঁকে বললেন যে মহাদেবভাই অসুস্থ। কিন্তু এ কথায় কি করে তিনি বুঝতে পারবেন যে মহাদেবভাইয়ের শেষ সময় উপস্থিত! তিনি মহাদেব ভাইয়ের বিছানার কাছে এসে ডাকলেন, "মহাদেব, মহাদেব!" কিন্তু কোন উত্তর নেই। 'বা' মহাদেব ভাইয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে ডাকলেন "মহাদেব, দেখ বাপু তোমায় ডাকছেন!" কিন্তু জীবনে এই প্রথম 'বা' ও 'বাপু'র ডাকে কোন উত্তর দিলেন না মহাদেবভাই। আমি উত্তেজক ইন্‌জেকশান দিলাম দ্রুত। কিন্তু কোন ফল হলো না। আস্তে নিঃশ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতা-বেদীতে প্রথম বলিদান হলো।

বিনা মেঘে এ বজ্রপাত 'বা'র পক্ষে অসহনীয় হলো। নির্ভয় হতে চেষ্টা করলেন, প্রার্থনায় যোগ দিলেন; কিন্তু অশ্রুধারা বয়েই চললো। তাঁর জগৎ যেন শুধু ঘুরতেই লাগলো।

বন্দী শিবিরের ঘেরার মধ্যেই দাহ করার জন্য দেহকে নীচে নিয়ে যাওয়া হলো। 'বা' শ্মশানে যাবার জন্য জোর করতে লাগলেন—

যদিও সিঁড়ি ভেঙ্গে একবার যাওয়া ও আবার ফিরে আসার পক্ষে শরীর তাঁর অতি দুর্বল। শ্মশানে গিয়ে সব কিছু দেখাটাও তাঁর ঠিক হবে না বলে আমরা মনে করলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে পেছনে রাখা গেল না।

শেষ যাত্রায় মহাদেবভাইকে তিনি বিদায় জানাবেনই। চিতার আগুন থেকে অল্প দূরে একখানা চেয়ারে বসে হাত জোর করে সারাক্ষণই বলতে থাকলেন, "মহাদেব, তুমি যেখানেই থাক, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। পুত্র, তিনি যেন তোমাকে সবসময়ে আনন্দে রাখেন! বাপুকে যে সেবা তুমি করেছ সবদিক থেকেই তা দুর্লভ!" ক্রমাগতই বলতে থাকলেন, "আমি গেলাম না, মহাদেব কেন গেল? এই কি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার?"

শবদাহের পর আমরা সকলেই বাড়ী ফিরে এলাম। তখন বিকাল ৫টা। মৃত্যুর মত স্তব্ধতা সর্বত্র। কে কাকে সান্ত্বনা দেয়?

মহাদেবভাই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন। 'বা'র মনে হয় এভাবে ব্রাহ্মণের মৃত্যু অশুভ লক্ষণ। "হ্যাঁ সরকারের পক্ষে অশুভ,"—বাপুর জবাব। 'বা'কে কিন্তু তা বিশ্বাস করানো গেল না। দিন কয়েক পরে আমাকে বললেন, "সুশীলা, ব্রহ্মহত্যার পাপ আমাদের কাঁধে পড়বে। বাপু আন্দোলন আরম্ভ করেন, তার ফলে মহাদেব জেলে এলো, এখানে তার মৃত্যু হল। তার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমরাই।"

"কেন এ ধরণের কথা ভাবছেন 'বা'?" তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম। "মহাদেবভাই মাতৃভূমির সেবায় জীবন দিয়েছেন। এ রকম মহান মৃত্যু কি করে পাপ হতে পারে? যদি কোন্ পাপ থাকে তা হবে সরকারের। কারণ বিনা কারণে তারা তাঁকে বন্দী করেছিল। সরকার যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাপু তখন আন্দোলন

সুরু করেন নি। তিনি সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সরকারের কু-মন। বাপুকে আন্দোলন করতে না দেওয়ার পেছনে সরকারের দুষ্ট মন।" "হাঁ" বললেন বটে কিন্তু মন খুশী হলো না।

'বা' গভীরভাবে ধর্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। কোন কিছুই তাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারতো না। নিয়মিত তুলসী গাছকে পূজো করতেন। মীরাবেনের ঘরে একটি ছোট বালকৃষ্ণ মূর্তি ছিল। একটি ছোট টেবিলে মূর্তিটি রেখে বেদীর মত করে খুব যত্নে ফুল সাজাতেন। 'বা' তুলসীতলায় প্রতিদিন যেতেন, বালকৃষ্ণ মন্দিরে (তিনি ঐ নাম দিয়েছিলেন) প্রতিদিন গিয়ে পূজো করতেন যেন সত্যিকারের মন্দিরে গিয়ে ভক্তি ভরে পূজো করছেন ঠিক তেমনি ভাবে। মহাদেব ভাইয়ের সমাধি তাঁর কাছে তৃতীয় মন্দিরস্বরূপ ছিল। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল তিনি বাপুর সঙ্গে সমাধি দর্শনে যেতেন দৈনিক, তার চারপাশে ঘুরে মাথা নত করে তারপর ফিরে আসতেন। ২রা অক্টোবর, বাপুর জন্মদিনে শ্রীমতী নাইডু সমস্ত বাড়ী আলোকমালায় সাজাবার ব্যবস্থা করলেন। আমাকে ডেকে 'বা' বললেন, "সুশীলা, শংকর মন্দিরে একটা আলো জ্বালাতে ভুলো না" প্রথমে আমি বুঝতেই পারলাম না শংকর মন্দির বলতে কি বুঝাচ্ছেন। তারপর চট্‌ করে বুঝে নিলাম। শংকর এবং মহাদেব দুই-ই শিবের নাম। "মহাদেব ভাইয়ের সমাধির কথা বলছেন তো 'বা'?"—বললাম। "নিশ্চয়,"—জবাব দিলেন। "ওই তো মহাদেব শংকরের মন্দির। তাই না?"

॥ কস্তুরবা ‘বা’ ছাত্রীরূপে ॥

বন্দী শিবিরের উপর গভীর দুঃখের মেঘ ঝুলছিল। আকস্মিক-মৃত্যু সব সময়েই গুরুতর আঘাত হানে। কারাগারে তার প্রভাব থাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য। শেষ পর্যন্ত দুঃখকে পরাস্ত করার জন্য গান্ধীজী একটি উপায় বের করলেন। “আমাদের প্রতি মুহূর্ত সময় যেন কাজে যায়। আমরা যেন এমন করে নিজেদের ব্যস্ত রাখি, অলস চিন্তা নিরাশা ইত্যাদির জন্য কোন সময়ই না থাকে। যে পৃথিবী হিংসায় পরিপূর্ণ সেখানে অহিংসার জায়গা করতে হলে আর অন্য কোন পথ নেই,”—বললেন।

যেখানেই থাকুন না কেন, গান্ধীজি সকল সময়েই ঘড়ির মত সময় মেনে কাজ করতেন। কখন কি কাজ করবেন তার ছককাটা তৈরী ছিল। আমাদের সকলের জন্য সে রকম সময়ের ছক কাটলেন। তিনি ‘বা’কে গুজরাটি, গীতা, ভূগোল এবং কখনও কখনও ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। অপরাহ্ণে যখন শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতেন তখন ‘বা’কে কিছু না কিছু পড়ে শুনিয়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। অল্পবয়স্ক ছাত্রের ঔৎসুক্য ও উৎসাহ নিয়ে ‘বা’ এ সব বিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। আরো আগে পড়াশুনা আরম্ভ করেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করতেন মাঝে মাঝে।

খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করলেও তাঁর মন বাপুর মত তরুণ ছিল না। বুঝতে পারলেন এ বয়সে নূতন জিনিস শেখা কঠিন। কখনো কখনো বাপু তাঁকে আগের দিনের পড়ান বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। সাধারণভাবে প্রশ্নের উত্তর তাঁর মনে থাকতো।

না এবং যদিও এজন্য বাপু কোনদিন তাকে তিরস্কার করেন নি, তিনি নিজে তা অনুভব করতেন এবং পাঠ ভাল করে শিখবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন। একদিন বাপু তাঁকে পাঞ্জাবের নদী ও জায়গার নাম শেখালেন। আমার কাছে এলেন 'বা'। বললেন,—"সুশীলা, একটা কাগজে এসব নাম আমায় লিখে দিবি?" তাই-ই করলাম। সারাদিন ঐ কাগজখানা তিনি সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন। এমন কি সূতো কাটবার সময়ে ও সামনে কাগজখানা মেলে রাখলেন। কিন্তু ৭৪ বৎসর বয়সে মুখস্থ করা ঠাট্টার ব্যাপার নয়। পরের দিন বাপু যখন জিজ্ঞেন করলেন তখন তিনি সে সব নাম বলতে পারলেন না।

বাপু তাঁকে প্রাকৃতিক ভূগোল শেখালেন এবং দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, বিষুবরেখা ইত্যাদি বুঝালেন। প্রতিদিন দুপুরের খাওয়া শেষ করে বাপু একটা কমলালেবু নিয়ে তাঁকে দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা ও বিষুবরেখা এমনভাবে দেখাতেন যে শেষ পর্যন্ত 'বা' সম্পূর্ণভাবে তা শিখে নিলেন। পরে একদিন আমার দাদা, যিনি এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, ঐ একই পাঠ মনুকে শিখিয়েছিলেন। 'বা'র অনুরোধে সরকার তাকে আনে 'বা'র সেবা-শুশ্রূষার জন্য। দাদা হিন্দুস্থানী শব্দ খুব ভাল জানতেন না। তাই দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা গুলিয়ে ফেলছিলেন। 'বা' শুনলেন তা। "সুশীলা, প্যারেলাল যাকে দ্রাঘিমা বলছে তা কিন্তু অক্ষরেখা! বাপু তো তাই-ই শিখিয়েছেন।"—বললেন আমাকে। দাদা ভুল শুদ্ধ করে নিলেন, কারণ 'বা'র কথাই ছিল ঠিক।

স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী গুজরাটি বই পড়ে শোনাতেন বাপু 'বা'কে। সে বইতে কতকগুলো কবিতা ও গান ছিল। কি রাগে গাইতে হবে তাও লেখা ছিল প্রত্যেকটির উপরে।

বাপুর কান গান ধরতে পারতো এবং এসব রাগেরও কিছু ধারণা করতে পারতেন। 'বা' কে এরকম দুখানা গান শেখাবেন স্থির করলেন। প্রত্যেকদিন প্রার্থনার পর রাত্রিবেলা প্রবীন দম্পতি বসতেন এবং দুজনে মিলে গান দুটি গাইতেন।

ভাবতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেব এবং তারপর প্রত্যেক প্রদেশের বড় সহর ও নগরের নাম শিখিয়েছিলেন তিনি 'বা'কে। 'বা' সেগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন কিন্তু সম্পুর্ণ সফল হতে পারতেন না। বাপুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন কোলকাতার রাজধানী লাহোর অথবা সে ধরণের কিছু উত্তর দিতেন। তাতে বুঝতে পারা যেতো যে, সমস্ত কিছু তিনি ধারণা করতে সমর্থ হচ্ছেন না।

ধীরে ধীরে উৎসাহ কমে আসতে লাগলো। প্রায়ই বলতেন, "সব সময়ে রুগ্ন শরীর হওয়ায় আমার মাথা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" তা সত্ত্বেও পড়াশুনা সম্পুর্ণ ত্যাগ করলেন না। গীতা পড়াতেই বেশী সময় দিতে লাগলেন। দুপুরে বাপুর সঙ্গে তিনি গীতা পড়তেন এবং রাত্রিবেলা সান্ধ্য প্রার্থনার পর আমার কাছে আবৃত্তি করতেন। এ পাঠ তিনি প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চালিয়েছেন।

মহাদেব ভাইয়ের মৃত্যুর পর 'বা' নিয়মিতভাবে সকাল ও সন্ধ্যায় বাপুর বেড়াবার সঙ্গী হতেন। বাপু তাঁর কাঁধের উপর ভর দিয়ে অনেক সময় বেশ জোরে হাটতেন। মাস খানেকের বেশী 'বা' এ পরিশ্রম সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বুকে ব্যথার অভিযোগ সুরু করলেন। তারপর থেকে আর কখনো তিনি বেড়াতে যেতে পারলেন না। যখন একটু ভাল হলেন বারান্দায় আস্তে আস্তে হাঁটতেন আর বাপু হাটতেন নিচেকার বাগানে। হাঁটবার পর

সিঁড়ির উঁচু ধাপে বসে বাপুর হাঁটা দেখতেন। সেখানে তাঁর চেয়ারে বসে তিনি আশ্রম ভজনাবলী অথবা অনাসক্তি যোগ পড়তেন প্রায় ঘণ্টা খানেক। তারপর 'গাত্রমর্দন' ও স্নানের জন্য উঠে যেতেন।

'বা' প্রায়ই সংবাদপত্র অথবা অনাসক্তি যোগ পড়তেন জোরে জোরে। সুর করে পড়াই ছিল তাঁর পড়ার রীতি। বাপু তা লক্ষ্য করে বললেন ও অভ্যাস শোধরাতে। ফলে জোরে জোরে পড়া ছেড়ে দিলেন তিনি। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত অভিমানী হয়ে পড়ছিলেন।

যদিও 'বা'র বয়স ৭৪ বৎসর তথাপি শিশুর সারল্য আর উৎসাহ ছিল তাঁর। শিখবার অত্যন্ত আগ্রহ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ধরে রেখেছিলেন। যখনি কাউকে নূতন কিছু করতে দেখেছেন তখনই তা শিখতে চেয়েছেন। সম্প্রতি ১৯৩১-৩৩ সালে লেখা 'বা'র ডায়েরী আমার হাতে পড়ে। ঐ সময়ের প্রায়ই তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন। জানতে পারলাম সে সময়েও তিনি উৎসুক ছাত্রী ছিলেন। তিনি মীরাবেনের কাছে হিন্দী এবং অন্য একজনের কাছে গুজরাটি শিখতেন। সঙ্গী কারাবাসীদের গামছা তৈরী করতে দেখে তিনিও গামছা তৈরী আরম্ভ করেন। পরে সেবাগ্রামে ঠিক তেমনি যখন দেখতেন তার ছোট্ট নাতি কানু ইতিহাস এবং ভূগোল শিখছে, বললেন ঐ দুই বিষয়ে তিনিও পাঠ নেবেন।

'বা'র হাতের লেখা ভাল ছিল না। তিনি প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা লিখতেন এবং মাঝখানে এমন অসমান ছিল যে অনভিজ্ঞ পাঠকের তা পড়তে খুবই বেগ পেতে হতো। বাপু এ বিষয়ে উন্নতি যাতে হয় তাঁর চেষ্টা করলেন। উপদেশ দিলেন লেখা অভ্যাস করতে। আমরা সকলেই তাঁর জন্য নোটবই কিনতে

পাঠালাম। 'বা' নিজেও একটা চাইলেন। বাপু একটুকরো কাগজ তার হাতে দিয়ে বললেন, তাঁর উপর লেখা অভ্যাস করতে। বললেন, "যখন লেখায় উন্নতি দেখাবে তখন তোমার জন্য একখানা নোটবই দেবো।" 'বা'র মনে খুব লাগলো এ কথা। বাপু নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তিনি আগে তা বুঝতে পারেন নি। তিনি শুধু তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখার নীতি অনুসরণ করে চলছিলেন। নিজের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষত সারবার নয়। শ্রীমতী নাইডু একখানা নোটবই কিনে আনলেন, আমি তা 'বা'র কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি শান্তভাবে বাপুর বইপত্রের মধ্যে তা সরিয়ে রাখলেন, আমাদের সকলের শত অনুরোধে ও তা ব্যবহার করতে অস্বীকার করলেন। বাপুও চেষ্টা করলেন কিন্তু 'বা' শান্ত আত্মমর্যাদা নিয়ে জবাব দিলেন, "আমার নোট বইয়ের কি দরকার?" শেষপর্যন্তই বাপুর কাগজপত্রের মধ্যে নোটবই খানা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল।

১২

॥ ধর্ম সম্বন্ধীয় পাঠ-অভ্যাস ॥

'বা'র পুরানো দিনলিপি পড়ে জানতে পারি ১৯৩১-৩৩ সালের মধ্যে 'বা' তিনবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রতিবারই বন্দী জীবনের সমস্ত সময় নিয়মিতভাবে ভাগবত ও রামায়ণ শুনেছেন কারো না কারো মারফতে পড়িয়ে। আগা খাঁ প্রাসাদে প্রতিদিন সান্ধ্য প্রার্থনায় তুলসী রামায়ণ থেকে দুটি স্তবক আবৃত্তি করতাম।

'বা' রামায়ণ নিয়ে বিকালে বসতেন এবং ব্যাখ্যার জন্য দেওয়া টিকার সাহায্যে সন্ধ্যাবেলায় আবৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট শ্লোক পড়তেন। সেবাগ্রামেও তিনি তাই করতেন।

গান্ধীজির অনশনের কালে প্রার্থনায় আবৃত্তির স্তবক 'বা'কে অর্থসহ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। আমার যতদূর সাধ্য তাঁকে সরল গুজরাটি ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। 'বা' খুব মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং যে অংশে গভীর ধর্মতত্ব এসে পড়তো তিনি নিজের মত দিতেন সে সময়ে। এই কার্যসূচী নিয়মিতভাবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি পালন করেছিলেন। জীবনদীপ নিভে যাওয়ার তুই কি তিনদিন আগে তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখায়। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন তাই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বা', আজ রাতে রামায়ণ শোনাবো তো?" তিনি বিরক্ত হলেন,—"যেমন পড় তেমন পড়তে না বসে ও ধরণের প্রশ্ন করছো কেন?" রামায়ণ আনতে আনতে জবাব দিলাম, "খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল আপনাকে, তাই জিজ্ঞেস করলাম 'বা'।" "বিছানায় শুয়ে শুয়ে রামায়ণ শোনা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে না। নাও, আরম্ভ কর।" শান্তভাবে জবাব দিলেন।

গান্ধীজি যখন তুপুরে খেতে বসতেন তখন তাঁরই সাহায্য নিয়ে আমি সংস্কৃত বাল্মিকী রামায়ণ পড়তাম। সে সময়ে 'বা'ও শুনতে আসতেন। পরে 'বা'র অসুস্থতার জন্য এই পড়া বন্ধ করতে হয়। গান্ধীজী সংক্ষিপ্ত বাল্মিকী রামায়ণের জন্য কিছু বিশেষ বিশেষ অংশ সংগ্রহ করবেন ঠিক করলেন।

ধর্ম বিষয়ক পুস্তক গভীর আগ্রহ জাগাতো 'বা'র, ভাগবত-পুরাণ আনিয়ে সমস্তটাই পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর থেকে বিশেষ বিশেষ দিনে (যেমন একাদশীর দিন এবং সে রকম দিনে) তিনি

ভাগবত শুনতেন। জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছবার সময় নিয়মিত আবার ভাগবত শুনতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এমন হলো, ভাগবত শুনবার সময়টিতেই লোকজনের দেখা করতে আসার সময় পড়ে গেল। ফলে লোকজনের আসা যাওয়া ও কথাবার্তার দরুণ ভাগবত পাঠ বন্ধ করে দিতে হলো। একবার একনাগাড়ে ছয়দিন ধরে লোকজনের আনাগোনা চলতে থাকে। সাতদিনের দিন ভাগবত পড়তে গেলাম না। নিজেও শ্রান্তিবোধ করছিলাম। মনে মনে বললাম, "'বা'র ও হয়তো মনে না থাকতে পারে, আগামীকাল যাবোখন পড়ে শুনাতে ···।" কিন্তু 'বা'র মনে ঠিকই ছিল। তিনি মনুকে ডেকে পাঠালেন, ভাগবত শুনলেন। তারপর থেকে কাছে যাবার আর সাহসই রইলোনা। মনুই তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলোতে ভাগবত পাঠ শুনিয়েছিল। অনুপস্থিতির জন্য তাঁর কাছে বকুনি খাবার ভয়েই পিছিয়ে ছিলাম। আজ সেজন্য দুঃখবোধ করছি। অন্ততঃ একদিনের জন্যও অলস হয়ে পড়েছিলাম, এ অত্যন্ত খাবাপ কথা। তার পরদিনই যদি 'বা'র কাছে যেতাম, তিনি হয়তো বা কিছু তীক্ষ্ণ শব্দ ব্যবহার করতেন কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে থাকতো খুশী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা আমি করতে পারিনি। ভুলে গিয়েছিলাম সে মুহূর্তে সেই অমূল্য কথা যে আমরা সকলেই মুহূর্তের জীব। সেবা করবার সুযোগ যেন আমরা না ছাড়ি। একবার সুযোগ হারিয়ে ফেললে জীবনে আর তা নাও আসতে পারে।

একাদশীর দিন 'বা' উপবাস করতেন। 'একাদশী' পালন করেন নি এমন একদিনের কথাও মনে করতে পারছি না। ঠিক সেভাবে প্রত্যেক সোমবার এবং পূর্ণিমা-অমাবস্যা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ইত্যাদি উপলক্ষে উপবাস করতেন। কখনো কখনো দুই কি তিনদিন পরপর

পড়ে যেতো। তখন দুই তিন দিনই উপবাস চালিয়ে যেতেন। শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্বলতার নজিরে কখনোই ব্রতভঙ্গের কথা ভাবতেন না। এ ছাড়া তিনি 'স্বাধীনতা দিবস' 'ভারত ছাড় দিবস' এবং জাতীয় সপ্তাহের প্রথম ও শেষদিন উপবাস করতেন।, কোনদিন এ বিষয়ে ভুল হয় নি তাঁর। এমন কি শেষ অসুস্থতার সময়ও একাদশী অথবা সংক্রান্তির কথা তিনি ভোলেন নি। মকর সংক্রান্তির দিন আমাদের বলে পাঠালেন কিছু তিল ও লাড্ডু বানিয়ে যারবাদা বন্দী শিবিরে যে সব বন্দী তাঁকে সেবা করতে আসতেন তাদের মধ্যে বিলি করতে। গান্ধীজি বললেন "এটা ঠিক হবে না। ভুলে যেওনা যে আমরা কারাগারে আছি। ওসব করতে হয় বাড়ীতে, কারাগারে নয়।" "কিন্তু আমি তো আর বাড়ী ফিরে যাবো না—" উত্তর দিলেন 'বা'। পরদিন আমরা কিছু তিল আনালাম এবং মিষ্টি তৈরী করলাম। 'বা'কে তাঁর চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে কয়েদীরা এক এক করে এলো তাঁর কাছে। নিজ হাতে তিনি তাদের তিলের নাড্ডু দিলেন।

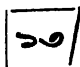
'বা' শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পরিণত জ্ঞান ছিল। আদর্শ হিন্দু স্ত্রী ছিলেন তিনি। স্বামী সেবাকে রেখেছিলেন সকল কিছুর উপরে। তাঁর কাছে ধর্মের প্রকৃত অর্থ হলো স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

বেড়াবার সময় মনু প্রায়ই বাপুকে গল্প বলার জন্য ধরতো। বাপু নীতি কথার কয়েকটি গল্প তাকে বলেন। একদিন আমি এক প্রস্তাব করলাম। "আপনার নিজের গল্প আমাদের বলুন না কেন বাপু।" তিনি রাজী হলেন। তাঁর নিজের মুখ থেকে তাঁর নিজের গল্প শোনা আত্মজীবনী পড়ার চেয়ে অনেক বেশী মজার। আকর্ষণীয় অনেক বর্ণনাই বইয়ে বাদ পড়ে গেছে। ছেলেবেলাকার কথা বিবাহের

আগে কেমন করে 'বা'র সঙ্গে খেলতেন, বিবাহের কথা, ইংলণ্ডে তাঁর ছাত্রজীবন, ভারতে ফিরে আসা এবং পরপর দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাওয়া ইত্যাদির গল্প আমাদের বলতেন। কি ভাবে 'বা' তাঁর পূর্ব সংস্কার কাটিয়ে স্বামীর সমতালে চলবার চেষ্টা করলেন তার বর্ণনা দিলেন বাপু। "বাড়ীর মহিলারা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন নিশ্চয়ই। তাঁরা তাঁকে বলতেন, 'আমরা আমাদের গোঁড়ামী ছেড়ে অস্পৃশ্যদের ঘরে ''সতে দেবো না অথবা মুসলমানদের ছোঁয়া খাবো না, কিন্তু তোমার শা আলাদা। তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলো স্বামীর পথ অনুসবণ করা। সে পথে চলতে গিয়ে যাই কর না কেন, তাতে কোন পাপই তোমায় স্পর্শ করবে না। এর ফল ভাল ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। 'বা' সব সময়েই এই উপদেশ পালন করতে চেষ্টা করতেন। আমার পথে পা রাখতে গিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সব সময়েই সব কিছু যে বুঝতে পেরেছেন তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি সব সময়েই বিশ্বাস করেছি যে তাঁর বিচার-বুদ্ধি হৃদয়েরই অনুগামী হয়েছে। যা-ই তিনি করেছেন বিশ্বাসের সঙ্গে করেছেন, সমস্ত হৃদয় ও আত্মা দিয়ে করেছেন। পরে—প্রথমত বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি যে সব কাজ করেছেন সবই প্রায় বিচার করতে সমর্থ হতেন"।

'বা' নিয়মিত সুতো কাটতেন, প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ তার সুতো হতো। গঠনমূলক কার্যসূচীর অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা তিনি বেশ বুঝতেন। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী থাকাকালে বেশী সুতো কাটতে পারতেন না। হৃদরোগ প্রথম শুরু হবার পর, তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবার কথা বলতে বাধ্য হলাম। সুতো কাটা বন্ধ করতে অনুরোধ করা এবং একই সঙ্গে ঘরের মধ্যে আনাগোনা সহজ কাজ ছিল না। গেলেই জিজ্ঞাসা করতেন, সুতো কাটা আমার

হার্টের ক্ষতি করবে কেমন করে ? কারাগৃহের সর্বোচ্চ পরিদর্শক (আই. জি. পি) তাঁকে বললেন, " 'বা' যদি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম না নেন, আমি তাহলে আপনাকে যারবাদা নিয়ে যেতে বাধ্য হব।" 'বা' এত সরল ছিলেন যে এই কৌশল বুঝতে পারলেন না, বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেবেন কথা দিলেন। এতে খুব দ্রুত ফল ফললো, চার পাঁচদিনের মধ্যে 'বা'র শরীরের উন্নতি চোখে পড়ল। চরকা বন্ধ করা ভাল হলো। 'বা'র ধারণা হলো চরকা চালালে হৃদরোগের আক্রমণ হয়। পরে আমরা সূতো কাটায় 'বা'কে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিলাম যাতে অসুখের চিন্তা থেকে তাঁর মন সরে থাকে, কিন্তু তা কার্যকরী হলো না। চরকা একবার দুইবার নিয়ে বসলেও আর কখনোই নিয়মিতভাবে তা গ্রহণ করলেন না।



॥ উৎকণ্ঠার দিনগুলি ॥

এবারের মত আর কখনোই কারাজীবন 'বা'র পক্ষে অসহ্য মনে হয় নি। তাঁর ধারণা সরকার তাঁদের সকলকে বিনা কারণে গ্রেফ্তার করেছে। সংবাদপত্রে সরকারী নিষ্ঠুরতার যেটুকু খবর প্রকাশের অনুমতি পায় তার সমস্তটুকু পড়ে তিনি মর্মাহত হতেন। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দী করে রাখা তাঁকে মানসিক কষ্ট দিত। মহাদেব ভাইয়ের মৃত্যুর পর 'বা'র মনের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি দানা বাঁধলো যে তিনিও বোধহয় জীবিত অবস্থায় আর কারাকক্ষের বাইরে যেতে পারবেন না। ১৮ই আগষ্ট, মহাদেব ভাইয়ের মৃত্যুর তিনদিন পর এই ভয়ের কথা তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। কারাগার

থেকে বেরিয়ে আমরা কে কি করবো সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম 'বা' বললেন, "কে জানে জীবিত অবস্থায় আর এখান থেকে বের হবো কিনা। এখন বেঁচে আছি, বিকালে নাও থাকতে পারি।" বাপু তাঁর মন্তব্য শুনে ফেলে বললেন, "ও ধরণের কথা বলছো কেন? অবশ্য যা বললে এক হিসাবে তা সত্য এবং সকলের বেলাতেই খাটে। এই যেমন সুশীলা। সে তরুণী সদ্য এম্, ডি হয়েছে। এখন সে এখানে বসে আছে কিন্তু এমনও সম্ভব যে বিকালে সে বেঁচে নাও থাকতে পারে। মহাদেব তো ওভাবেই গেল, অথচ তুমি আমি যাঁরা বহু বছর ধরে অসমর্থ হয়ে আছি তাঁরা মরদেহে এখনো বসে আছি। একথা ভেবে মন থেকে সব বিষণ্ণভাব তোমার দূর করে দেওয়া উচিত। যতখানি যত্ন আত্তি প্রয়োজন সবই নাও এবং ভাল হয়ে উঠবাব জন্য মনস্থির কর।"

১৯৪২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজীর মৌণ দিবস। তিনি বড়লাটেব কাছে পাঠাবার জন্য একখানা চিঠি মুসাবিদা করলেন। 'বা' একথা শুনলেন পরদিন। বাপু কি লিখেছেন সে বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। কিন্তু গান্ধীজীর মুখ দেখে আন্দাজ করলেন কোন না কোন গোলমাল সুরু হতে যাচ্ছে। তাঁকে বললেন 'বা', "বড়লাটের কাছে যা লিখবার লিখুন, কিন্তু দোহাই, অনশন সুরু করার কোন কথা লিখবেন না।" গান্ধীজী হাসলেন। তিনি অনশনের কথা লিখেছেন চিঠিতে! আমরা সকলেই তাঁকে অনুরোধ করলাম তা কেটে দিতে। "কে বলতে পারে, হয়তো আপনার চিঠি সরকারের বিবেকবোধ তাড়াতাড়ি জাগাতে ও ঠিক কাজ করাতে পারে। যা-ই হোক্ না কেন, তাদের এমন কোন সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যাতে তারা বলতে পারে যে অনশনের ভীতি দেখালে আপনার কোন কথা শুনবে না।" তিনি সম্মত হলেন।

নববর্ষের সুরুতে বড়লাটের কাছে নিজের হাতে একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন এবং ডাকে ফেলবার জন্য পাঠালেন। উত্তরের অপেক্ষায় কাটাবার সময় গান্ধীজী আত্মবিশ্লেষণ ও প্রার্থনায় বহু সময় ব্যয় করলেন, পরবর্তী পদক্ষেপের পথে আলো প্রার্থনা করে। মীরাবেন বললেন, "বাপুর নির্জনতা দরকার। চলুন আমরা বাগানে আমগাছের নীচে একখানা কুটির তৈরী করে দি।" 'বা' এ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। "কুটিরের আবার দরকার কি? বাপু যে কোন জায়গায় বসেই নির্জনতার অভিজ্ঞতা পেতে পারেন।" বাপু ও বললেন, "যে নির্জন প্রশান্তি আমার দরকার তা ভিন্ন প্রকৃতির। 'বা'কে দূরে রাখতে পারিনা, তা করতে আমি চাই না। আমার কামরাতেই যেমন আছি তেমনই থাকবো।"

বড়লাটের সঙ্গে পত্র ব্যবহার যতই চলতে লাগলো অনশনের সম্ভাবনা ততই বেশী হল। সরকার ক্ষমতা-মদে মত্ত! বাপুর কথা শুনবার জন্য আগ্রহী নয়। তাঁর অনশণের চিন্তাই আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত বিব্রতকর। আমরা জানি গান্ধীজীর এ অগ্নিপরীক্ষা দেবার শক্তি সীমিত। একদিন আমার দাদা প্যারেলালজী এলেন আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, "শরীরের বর্তমান অবস্থায় বাপু কতদিন পর্যন্ত অনশন সহ্য করতে পারবেন বলে মনে করিস্?"

বললাম, "একেবারে নির্দিষ্ট করে তা বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ১৯৩৮ সালের রাজকোট অনশণের সময় পঞ্চম দিনেই তাঁর অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়েছিল। সে দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় দীর্ঘদিন অনশণ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।"

শ্রীমতী নাইডু দৃঢ়ভাবে বললেন, "না, অনশণ করা কিছুতেই চলবে না। এই বয়সে, এই দুর্বল শরীরে তিনি অনশণ করলে বাঁচবেন না,—চরম আত্মদানের সময় এখনো আসেনি।"

'বা'কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হল। শ্রীমতী নাইডু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন,—"চিন্তা করবেন না 'বা'। বাপু বলেছেন ভগবানের স্পষ্ট নির্দেশ না পেলে তিনি অনশণ করবেন না। ভগবান নিশ্চয়ই তাঁকে সে নির্দেশ দেবেন না।"

"আমি জানি তা," 'বা' জবাব দিলেন। "কিন্তু যদি বাপু মনস্থির করে ফেলেন যে এ ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, তখন কি উপায় হবে?"

প্রত্যেকদিন বিকালে বাপু আধ ঘণ্টার জন্য নীরব প্রার্থনায় বসতেন, অন্তর আলোকের জন্য করতেন প্রার্থনা। স্নান সেরে প্রতিদিন সকালে 'বা'ও আধঘণ্টাব জন্য তুলসী তলায় প্রার্থনায় বসতেন। স্বামীর দীর্ঘ জীবনের জন্য এবং যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি, সে কাজে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতেন।

অবিশ্রান্ত দুর্ভাবনায় 'বা'র শক্তি ক্ষয় হতে লাগলো। তিনি, মীরাবেন এবং শ্রীমতী নাইডু প্রতি শনিবার মহাদেব ভাইয়ের সমাধিতে যেতেন ফুল দেবার উদ্দেশ্যে। এখন 'বা'র যাওয়া প্রায়ই বন্ধ হবার উপক্রম হলো। অতদূর হাঁটা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এতে আমার উৎকণ্ঠা বাড়লো। আমরা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলাম, "বাপুর উপবাস যখন সত্যি সত্যিই আরম্ভ হবে তখন 'বা'র শরীরের কি অবস্থা হবে।" আমরা সকলেই একমত হলাম যে বর্তমানে ও রকম অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত তিনি নন। শ্রীমতী নাইডু গান্ধীজীর কাছে গেলেন।

"বাপু, আপনাব অনশণ 'বা'র মৃত্যু ঘটাবে," বললেন। বাপু হাসলেন। "তোমাদের সকলের চেয়ে তাঁকে জানি বেশী আমি" জবাব দিলেন। "তিনি কতদূর সাহসী হতে পারেন সে বিষয়ে তোমাদের কোন ধারণাই নেই। তোমরা কেউই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওনি। বাষট্টি বছর ধরে আমি তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি। এবং

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমার অনশণ তোমাদের যে কোন কারো চেয়ে বেশী সহ্য করতে পারবেন তিনি। আমার হরিজন-অনশনের সময় 'বা' আমার সঙ্গে ছিলেন। যখন জীবনের সব আশা হারিয়ে ফেলি তখন স্থির করলাম আমার সামান্য জিনিসপত্র যা কিছু আছে সব হাসপাতাল—কর্মীদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। 'বা' আমার ইচ্ছা পালন করলেন এবং নিজের হাতে জিনিসপত্র গুলি বিলিয়ে দিলেন, আর চোখে এক ফোঁটা জলও ছিল না তাঁর !"

'বা'র ১৯৩৩ সালের ডায়েরীতে লেখা ছিল "স্নানের পর হাসপাতালে যাই। মথুরাদাস ছিলেন আমার সঙ্গে। একটা বাস্কেটে জিনিসপত্র গুলো গুছিয়ে নি'। বাপু আমাকে বলেছিলেন যা কিছু জিনিসপত্র আছে সবই হাসপাতালে বিলিয়ে দিতে। আমি সেইমত কাজ করেছি। তিনি আমায় বলেছিলেন, এবার আমি আর বেঁচে থাকবো না মনে হচ্ছে। তুমি দুঃখ করবে না বা ভেঙ্গে পড়বে না। সেটিই হবে যথাযোগ্য কাজ। কিন্তু ভগবান দয়াময়। তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করবার জন্য সব সময়েই আসেন। তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

ভগবানে তাঁর বিশ্বাস খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। সরকার গান্ধীজীকে সেইদিনই বিকালে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন, হরিজন —অনশণেরও অবসান ঘটলো।

'বা'র সহ্যশক্তি ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বাপুর ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। একদিন সন্ধ্যায় 'বা'কে তাঁর অনশন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথাবার্তা—বললেন। পরদিন 'বা' বললেন আমাদের, "যে সমস্ত অসত্য ও মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে তার নীরব সাক্ষী কি বাপু হতে পারেন ? বাপুর অনশণ ছাড়া সরকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ করার অন্য আর কি উপায় হতে পারে?" তাঁর নির্ভীক মনোভাবে আশ্চর্য হলাম আমরা। বাপু অনশণ করবেনই, এ বিষয়ে আব কোন সন্দেহ রইল না।

১৪

॥ অনশন ॥

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ সাল,—গান্ধীজী সকালের খাওয়া শেষ করলেন। তাবপর অল্প সময় প্রার্থনার শেষে একুশ দিনের অনশন আরম্ভ হলো। সেইদিন গান্ধীজী অন্যান্যদিনের মতই সান্ধ্য-ভ্রমণ করলেন, মহাদেব ভাইয়েব সমাধিতে প্রার্থনার পর ফুল দিলেন। ভ্রমণের সঙ্গী হলেন 'বা'।

বাপুর অন্যান্যবারের অনশনের মতই এবারও 'বা' পেটভবে খাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং দুধ ও ফলের উপরই নির্ভর করলেন। অবশ্য অন্যান্যবার অনশনে একবার মাত্র দুধ ও ফল খেতেন সারাদিনে। এবার তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে আমরা তা না করার জন্য জোর দিলাম। বহুকষ্টে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবশেষে চব্বিশ ঘণ্টায় দুবার দুধ ও ফল খাবার জন্য রাজী করানো গেল।

দিনে দুবার কি তিনবার তিনি এক পেয়ালা—গরম জল ও মধু খেতেন। গান্ধীজীর অনশণের সময় তাঁর শিয়রে সারাক্ষণই প্রায় বসে কাটাতেন। হাতে পেয়ালা নিয়ে বসতেন এবং কিছু করবার থাকলে সে কাজ আগে সেরে ফিরে পেয়ালায় চুমুক দিতেন। একদিন ডাঃ গিল্ডার মন্তব্য করলেন: "এ কিন্তু ঠিক নয়। সরকারী কর্মচারীরা ভাবতে পারেন যে তিনি গরম জলের কাপ ও মধু নিয়ে

ঘুরছেন যাতে গোপনে বাপুকে খাওয়াতে পারেন।" 'বা'র সঙ্গে এ কথা আলোচনাও করলেন। 'বা' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না, বাপু সম্বন্ধে কখনোই কেউ এ অবিশ্বাস পোষণ করতে পারে না!"

অনশনের তৃতীয় দিনে গান্ধীজীর গা বমি সুরু হলো। জলটি পর্যন্ত খেতে পারলেন না। 'বা' তাঁকে বললেন জলের সঙ্গে একটু মিষ্টি লেবুর রস মিশিয়ে নিতে। তিনি অসম্মত হলেন। বললেন, "শাদা জল পান করা একেবারে অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশাতে চাই না।" বমি বমি ভাব ও বমি খুব বেশী হয়ে দাঁড়াল। জলপান একদম করতে পারছিলেন না। রক্ত ঘন এবং মূত্রাশয়ের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু 'বা' দ্বিতীয়বার আর নিজের মত প্রকাশ করলেন না। তিনি জানতেন যে গান্ধীজী যা ঠিক বলে ভাববেন তাইই করবেন। "কথা কাটাকাটি করে বাপুর শক্তি ক্ষয় করি কেন?" 'বা' নিজেকে বোঝালেন।

অনশনের দিন যতই বাড়তে লাগলো, 'বা' ততই বেশী সময় কাটাতে লাগলেন তুলসীতলায় এবং বালকৃষ্ণ মূর্তির সামনে প্রার্থনায় বসে। ২২শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়ালো। জীবন-দীপ নির্বাণোন্মুখ। আমি তাঁর শিয়রের কাছে ছিলাম। মীরাবেন এলেন, আমাকে নিঃশব্দে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে 'বা' হাত জুড়ে আসন করে বসেছেন, চোখ বন্ধ; তুলসী গাছের নীচে প্রণাম করছেন। তাঁর সমস্ত মুখে প্রশান্তি, বিনীত প্রার্থনার ভাব ছিল যাতে দর্শকদের চোখে জল এলো। আমরা কিছুক্ষণ তাঁকে দেখলাম, তারপর ফিরে এলাম। গভীর প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। কে এলো গেলো সে সম্বন্ধে কোন খেয়ালই ছিল না।

২২শে ফেব্রুয়ারী অনশনের 'ত্রয়োদশ দিবস'। গান্ধীজী এত

বেশী দুর্বল হয়ে পড়লেন যে নলের মধ্য দিয়ে অনেক চেষ্টায় তিনি আধ্-আউন্স জল ও পান করতে পারলেন না। এই চেষ্টার ফলে নির্জীব হয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় বিছানার উপর পড়ে গেলেন। নাড়ী অতি ক্ষীণ হয়ে পড়ল, শরীর ঠাণ্ডা এবং চট্‌চটে। কথা বলা বা ইশারায় নিজেকে প্রকাশ করার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। আগেই বলেছি 'বা' তুলসীতলায় প্রার্থনায় মগ্ন আর গান্ধীজীর কামরায় একা আমি। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে পারে ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "বাপু, পানীয় জলের সঙ্গে মিষ্টি লেবুর রস মিশাবার সময় হয়েছে বলে মনে করেন না কি?" কয়েক মিনিটের জন্য কোন জবাব নেই। খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম। তারপর সামান্য মাথা নড়লো, যেন জলে মিষ্টি লেবুর রস মিশাবার অনুমতি দিলেন। আর দেরী না করে তক্ষুণি আমি তাজা মোসাম্বির রস দুই-আউন্স পরিমাণ নিয়ে দুই-আউন্স জলের সঙ্গে মিশালাম। খুব ধীরে ধীরে তাঁর গলায় ঢেলে দিলাম, তিনি তা গিলতে ও ধরে রাখতে সমর্থ হলেন। শরীরে সামান্য রস যেতেই জীবন শূন্য মুখে আবার জীবনের চিহ্ন ফিরে এলো। তিনি চোখ তুলে তাকালেন। ঠিক সে মুহূর্তে 'বা' ঘরে ঢুকলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন।

গান্ধীজীর অনশনের সময় আগা খাঁ প্রাসাদের ফটক খোলা থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য স্রোতের মত জনপ্রবাহ আসা যাওয়া করত সারাদিন ধরে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই আসত তাঁর কামরায়, শ্রদ্ধা জানিয়ে বাইরে যেতো। সেখানে তারা 'বা'র সঙ্গে কথা বলত। 'বা' আশ্চর্যরকম সাহসী ছিলেন। দিন ভর এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। দর্শনকামীদের সঙ্গে কথা বলাতেই ব্যস্ত থাকুন অথবা গান্ধীজীর কাছে খবর নিয়েই যান, যে

কোন অবস্থাতেই তিনি নিজেকে খুশী এবং হাসিমুখে রেখেছিলেন। দর্শকদের মধ্যে তাঁর ছেলেমেয়ে এবং নাতিনাত্নীরাও ছিলেন। তা ছিল 'বা'র কাছে পরম সান্ত্বনার। স্বামীর পদক্ষেপ অনুসরণ করতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীকেই তিনি নিজ পরিবার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ তাতে কমে যায় নি। তারা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অনশনের সময় কাউকেই যেন 'মিষ্টিমুখ' করানো না হয়, গান্ধীজীর কড়া নির্দেশ ছিল। কিন্তু 'বা'র পক্ষে এ বিধি মেনে চলা ছিল বড়ই কষ্টকর। বিশেষ করে তাঁর ছোট ছোট নাত্নীদের বেলায়। কিন্তু তিনি নিষেধ অগ্রাহ্য করেন নি।

অবশেষে একুশদিনের অনশন সমাপ্তির রেখা টানলো। অনশন ভঙ্গের সময় সরকার কেবলমাত্র ছেলেদের থাকার অনুমতি দিলেন, বন্ধুবান্ধবদেরও নয়। বহু বৎসর যাবৎ গান্ধীজী এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নি। সেজন্য তিনি ঠিক করলেন ছেলেরাও যেন না আসে। ২রা মার্চ অনশনের শেষ দিন। সকলের বিদায় নেবার সময় 'বা'র চোখ ভিজে উঠছিল। সবরমতী আশ্রমের লক্ষ্মীবেন খারে ও অন্যান্য মহিলাদের বিদায় দেবার সময় বললেন, "এই-ই আমার শেষ বিদায় সম্ভাষণ।" "না, 'বা', ও ভাবে বলবেন না। আমরা শীগ্‌গীরই সব ছাড়া পেয়ে যাবো,"—বাধা দিয়ে বললাম। 'বা' শান্ত সুরে জবাব দিলেন, "হাঁ, তোমরা সকলেই বাইরে যাবে।"

১৯৪৩, ৩রা মার্চ গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করলেন। এর তিন কি চারদিন পর সরকার রামদাস গান্ধী ও দেবদাস গান্ধীর অনুমতি-পত্র নিয়ে নিলেন, যাতে তাঁরা তাঁদের পিতাজীকে দেখতে আসতে না পারেন। তাঁদের জানানো হলো গান্ধীজী দ্রুত ভাল হয়ে উঠছেন, সব বিপদ কেটে গেছে। অতএব আগেকার বাধা নিষেধ

আবার চালু হল। ছেলেদের আসা যাওয়া 'বা'র পক্ষে বলকারক ঔষধের কাজ করছিল। কারা-দুয়ার বন্ধ হওয়ায় আবার তিনি দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। বাপুর অনশনের সময় একমাত্র তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পই শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তার সঙ্গে মোকাবিলার সাহায্য করেছে। এখন তার প্রতিক্রিয়া সুরু হল। অল্পেই ক্লান্ত হতে লাগলেন। তাঁকে বিষণ্ণ দেখাল। ১৬ই মার্চ তিনি খিঁচুনি সমেত দ্রুত স্পন্দিত হৃদ্‌রোগে প্রায় দুই ঘণ্টা আক্রান্ত হয়ে রইলেন। ২৫শে মার্চ আবার আক্রান্ত হলেন এবং তা স্থায়ী হল ৪ ঘণ্টা। সেই থেকে তাঁর অসুস্থতা বেড়েই চললো।

অনশন সুরু হবার আগে, গান্ধীজী বলতেন যে ছয়মাসের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য। বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকার লোকজনকে বন্দী করে রাখতে আর পারবে না। ছয় মাসের পর বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। হয় আন্দোলন এতখানি সফলতা লাভ করবে যে সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হবে অথবা আন্দোলনকে তারা এমন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে যাতে তাদের আর কারাগারে রাখবার কোন প্রয়োজনই থাকবে না। অনশনের পর তাঁর সে ধারণা বদলে গেল। তিনি বলতে লাগলেন যে আমাদের হয়তো কমপক্ষে আরও সাত বৎসর কারাগারে থাকতে হবে। এতে 'বা' মর্মাহত হলেন। সব সময়েই বলতেন, "আমি মহাদেবের পাশেই থাকবো। আরো সাত বছর জীবনের আশা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বাইরে যাবার আশা আমি করতে পারি না।" তা সত্ত্বেও তাঁর শিশুসুলভ সরলতা ও নিষ্পাপ বিশ্বাস তাঁর আশাকে জাগিয়ে রাখলো। তিনি বালকৃষ্ণ মূর্তির সামনে বসে সকলের যাতে তাড়াতাড়ি মুক্তি হয় সেজন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

গান্ধীজীর অনশনের সময় জয়সুখলাল গান্ধী দেখতে এলেন

বাপুকে। তিনি সেবাগ্রামে 'বা'র কাছে তাঁর মেয়ে মনুকে রেখে-ছিলেন। মনু ১৯৪২ সালে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন এবং সে সময়ে নাগপুর কারাগারে ছিলেন। জয়সুখলাল গান্ধী 'বা'কে জানালেন যে মনুর চোখ খুব কষ্ট দিচ্ছে। "সে যদি আপনার সঙ্গে থাকতে পারতো চোখ বেঁচে যেতো, সে সঙ্গে আপনাকে সেবা করার সুযোগও পেতো", বললেন। কথাটি 'বা'র মাতৃহৃদয় স্পর্শ করলো। মেয়েটির চোখগুলো যেন আরো খারাপ না হয় সে বিষয়ই তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। সে জন্য গান্ধীজীর কানে তুললেন কথাটি। "আমাকে দেখাশোনা করার জন্য কাউকে দরকার, মনুকে আনিয়ে নিলে হয় না?" বললেন। গান্ধীজী তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করলেন। সরকারকে কোন অনুরোধ করে তাদের 'না' বলার সুযোগ করে দেবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। কিন্তু 'বা' কিছুতেই নিবৃত্ত হলেন না। কর্ণেল ভাণ্ডারী ও কর্ণেল শাহ যখন তাঁকে দেখবার জন্য এলেন তাদের বললেন সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁর একজন কাউকে দরকার। এর মধ্যে ঘন ঘন তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হতে লাগলেন। ডাঃ গিল্‌ডার এবং আমি সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠালাম, তাতে লিখলাম 'বা'র একজন শুশ্রূষাকারী সঙ্গী দরকার। সরকারের টনক নড়লো। 'বা' মনুর নাম প্রস্তাব করলেন। সে অন্য প্রদেশে কারাগারে কাটাচ্ছিল। যদি কোন কারণে মনুকে পুণায় আনা সম্ভব না হয় তাহলে কাকে তিনি আনতে চান প্রশ্ন করলে তিনি মনিবেন প্যাটেল এবং প্রেমাবেন কণ্টকের নাম করেন। বম্বে সরকার এ দুজনের একজনকেও আনতে রাজী নয়। তাই মধ্য-প্রদেশ সরকারকে লিখলেন মনুকে পুণায় বদলি করার জন্য। ২৩শে মার্চ, মনু আগা খাঁ প্রাসাদে উপস্থিত হল।

মার্চের শেষে 'বা'র ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে

তাঁর পুরানো ব্যাধি বি-কোলাই দেখা দিল। উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে তা থামলো।

১৫

॥ বহুমুখী আগ্রহ ॥

'বা'র আগ্রহ ছিল বহুমুখী এবং কারাগারে আমরা আবিষ্কার করলাম যে খেলাধূলাতেও তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট। কারাগারে আমরা খেলার মাঠ তৈরী করে প্রায় নিয়মিত ভাবেই 'ব্যাডমিণ্টন' অথবা 'টেনিকয়ট' খেলতাম। 'বা' ও বাপু নিজ হাতে 'র‍্যাকেট' নিয়ে 'শাটলকক্' জালের এদিকে ওদিকে পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে ব্যাডমিণ্টন খেলার উদ্বোধন করেন। বারান্দায় চেয়ারে বসে 'বা' খুব আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখতেন। যদি কেউ খেলায় কোন অন্যায় পথ ধরতেন 'বা' জোরগলায় তাকে বাধা দিতেন। রাত্রিকালে মীরাবেন, ডাঃ গিল্ডার ও মিঃ কাটেলি 'ক্যারাম' খেলতেন। 'বা' সেখানেও যেতেন, খেলা দেখতেন। ক্রমে ক্রমে তিনিও ক্যারাম খেলা সুরু করেন। এ খেলার প্রতি তাঁর আগ্রহ এত বেশী হল যে তিনি প্রতিদিন বিকালে প্রায় আধ ঘণ্টা খেলা অভ্যাস করতেন। মীরাবেন ক্যারাম খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। 'বা' সব সময়েই প্রায় তাঁর জুটি হয়ে খেলতেন। সুতরাং তিনি সর্বদাই জিততেন এবং সেজন্য খুব খুশী হতেন। যদি হঠাৎ কখনো হেরে যেতেন তাহলে বিচলিত হতেন। এমন কি রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারতেন না। শেষটায় আমরা খেলোয়াড়েরা সকলে মিলে ঠিক করলাম যা-ই ঘটুক না কেন, শেষ খেলা এমনভাবে খেলতে হবে যাতে

'বা'র জিৎ হয়। ক্যারাম খেলার 'রাণী' পাওয়াকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন। রাণী পেয়েও খেলায় হারলে তিনি মনে করতেন খেলা ড্র হল। ক্যারাম খেলায় এমন মেতে রইলেন যে কিছুদিনের জন্য নিজের অসুখের কথা ভুলে গেলেন। শেষের দিকে যখন অত্যন্ত দুর্বলতার জন্য খেলা সম্ভব হতো না, আমরা ক্যারামবোর্ড তাঁর কামরায় নিয়ে আসতাম, তাঁর বিছানার কাছে বসে খেলতাম। এতে তিনি খুশী হতেন। জীবন দীপ নিভবার দুতিনদিন আগে আমরা তাঁর কাছে বসে খেলেছি। তিনি অসুস্থ হওয়ায় ক্যারাম তার চতুর্থ নম্বর সদস্যকে হারাল। মীরাবেন খুব ভাল খেলতেন, সুতরাং ডাঃ গিল্ডার ও মিঃ কাটেলি জুটি হিসাবে খেলতেন আর মীরাবেন দুজনের হয়ে বোর্ডের এক দিকেই একক খেলতেন। ফলে তাঁর হার হতে লাগল। তাঁর জুটি (অংশীদার) হেরে যাবে এটা 'বা' সহ্য করতে পারেতন না। ক্যারাম খেলায় আমাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না, কিন্তু তিনি বার বার জোর দিয়ে বলতেন মীরাবেনের সঙ্গী হয়ে কাউকে না কাউকে খেলতেই হবে যাতে তিনি জয়লাভ করতে পারেন।

পিংপং খেলাও আরম্ভ হল। তাতে 'বা' অংশ নিতে চাইলেন কিন্তু খেলতে গিয়ে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো। তাই সে খেলাও তাঁকে বন্ধ করতে হল। শরীর জীর্ণ হলেও বহু বিষয়ে তাঁর মন ছিল শিশুর মত সবুজ।

শিশুদের সঙ্গে খেলতে, তাদের যত্ন করতে 'বা' ভালবাসতেন। আশ্রমে সব সময়েই একজন কি দুজন ছেলেমেয়ে তাঁর স্নেহছায়ায় থাকতো। কারাগারে তা সম্ভব ছিল না। একবার গান্ধীজীর দুধের জন্য রাখা ছাগীদের মধ্যে একটির বাচ্চা হলো দুটি। মনু নবজাতকদের একটিকে 'বা'র কাছে নিয়ে গেল। তিনি বাচ্চাটিকে

কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন এবং কিছু খেতে দিলেন। তারপর তার সঙ্গে কথা বলতে স্রুরু করলেন। ভুলে গেলেন যে সেটি মানব-শিশু নয়, "খেলতে আসিস্", মনু বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে নেবার সময় বললেন, "আরে বাচ্চা, প্রত্যেকদিন আসবি খেলতে—।"

'বা' চমৎকার রান্না করতেন। আশ্রমে যখন রান্নাবান্না কম করার মন্ত্র নেওয়া হল তখন 'বা'ব রন্ধন-শিল্পও অকেজো হয়ে পড়ল। অবশ্য, মাঝে সাজে তিনি এটা ওটা রান্না করতেন। কারাগারে তিনি মনুকে বলে দিয়েছিলেন সকালে ডাঃ গিলডারের জলযোগের জন্য যেন ভাল ভাল খাওয়ার তৈরী করে। নিজেও তিনি ভাল খাবারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অন্যকে খাওয়াতেও ভালবাসতেন। একদিন মনুকে বললেন, "পুরণপুরী" বানাতে। "আমিও খাবো আজ" বললেন, "যাও বাপুকে জিজ্ঞেস করে এসো তিনিও খাবেন কি না।" মনু বাপুর কাছে সে খবর নিয়ে গেল। হজমের গোলমাল হলে 'বা'র হৃদ্‌রোগ বাড়তে পারে সেজন্য বাপু বলে পাঠালেন "'বা'কে বলগে আমি খাবো, যদি সে নিজে না খায়।" "বেশ আমি খাবো না,"—এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ না করে জবাব দিলেন 'বা'।

একদিন হৃদ্‌রোগ স্রুরু হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হল, পরদিন সকালে মনুকে বললেন ঘিয়ে বিশেষ রকম করে বেগুন ভেজে আনতে। মনু আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ও রকম জিনিস 'বা' হজম করতে পারবে কি না। গতকাল সন্ধ্যাবেলাকার হৃদ্‌রোগের কথা মনে করে ভাবলাম হালকা খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার ঝুঁকি আছে। মনু 'বা' কে গিয়ে বললে, "সুশীলাবেন আপনার জন্য বেগুন রান্না করতে মানা করছে।" এতে 'বা' বিরক্ত হলেন। আমার উপর ভীষণ রাগ করলেন, বাপুকে গিয়ে নালিশ জানালেন। বাপু সে সময় খুব ব্যস্ত ছিলেন। ধীর স্থিরভাবে

তাঁকে সমস্ত জিনিসটা না বুঝিয়ে শুধু বললেন, "মনে হয় স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তোমার খাওয়া সম্বন্ধে হুশিয়ার থাকা দরকার।" এতে তাঁর রাগ আরো বেড়ে গেল। ঠিক করলেন রান্না করা কোন খাবারই খাবেন না। মনু ও আমি অনেক বোঝালাম,—"আজ আপনাকে ঐ খাবার খেতে দেওয়া হল না শুধু শরীরের কথা ভেবে। তা না হলে আপনার জন্যে যে কোনরকম খাবার তৈরী করতে আমরা খুবই খুশী হতাম।" কিন্তু এত সহজে শান্ত হলেন না তিনি। বললেন, "আমার জন্য কোন কিছু তৈরী করার কারো দরকার নেই।" প্রায় পনেরো দিন তিনি দুধ, ফল, গরম জল এবং মধু ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। মনু ও আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু গান্ধীজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন,— "চিন্তা করো না, এতে 'বা'র ক্ষতি না হয়ে পরোক্ষে বরং উপকার হবে।" সত্যিই 'বা' সুস্থ রইলেন এবং শরীরের ওজনও কমলো না। আমরা তাঁকে বুঝাতে লাগলাম; তিনিও বেগুন ঘটিত ঘটনা ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন, আবার আগের মতই খাওয়া দাওয়া চললো।

১৬

॥ বাড়ীর দুঃসংবাদ ॥

২রা অক্টোবর, ১৯৪৩, কারাগারে বাপুর দ্বিতীয় জন্মদিন। 'বা'র স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। আমাদের সাহায্য করার জন্য শ্রীমতী নাইডুও ছিলেন না। সেজন্য আমরা যা ভাল বুঝলাম সে ভাবেই আয়োজন করলাম। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও 'বা' আমাদের সাহায্য করলেন এবং শাস্তি-পাওয়া বন্দীদের নিজের হাতে খাওয়া বিলালেন।

বাপুর হাতে কাটা সুতোয় তৈরী লাল পাড়ওয়ালা একখানা শাড়ী ছিল 'বা'র কাছে। সেবাগ্রাম আশ্রম ছেড়ে আসবার সময় সেখানা তিনি মনুকে দিয়ে আসেন। "শুনতে পাচ্ছি আশ্রম বাজেয়াপ্ত করা হবে; দেখো শাড়ীখানা হারিয়ে না যায়। আমি মারা গেলে এ শাড়ী দিয়ে আমার শরীর ঢেকে দেবে, তারপর সৎকার করবে।" আগা খাঁ প্রাসাদে আসবার পর তিনি বহুজনের কাছে লিখলেন শাড়ীখানার খবর জানতে চেয়ে। কিন্তু কেউ ঠিক কোন খবর দিল না। যখন মনু এলো, সে-ই জানালে কোথায় সেখানা রাখা হয়েছে। 'বা' সেখান থেকে আনিয়ে নিলেন। বাপুর জন্মদিনে সে শাড়ীই তিনি পরলেন।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষে আমার মেজো দাদার একটি মেয়ে জন্মাল। অস্ত্রোপচার করতে হয় সেজন্য। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে সাত দিনের শিশুকে রেখে বৌদি ইহলোক ত্যাগ করলেন। কারাগারের সমস্ত ব্যবস্থাপনাই এত ঢিলে ঢালা ছিল যে মৃত্যুর আট দিন পর, অস্ত্রোপচার এবং মৃত্যুর খবর নিয়ে তুখানা টেলিগ্রামই একসঙ্গে এসে পৌঁছায় আমার হাতে। দাদার চিঠিও এলো প্রায় সে সময়েই। শেষ সময়ে বৌদি আমার কথা কেমন করে বলতেন সে সব বর্ণনা ছিল চিঠিতে। আমরা তুজনেই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম, আমাকে তিনি ভালবাসতেন নিজের বোনের মত। দাদা ও মা তুজনেই সরকারের কাছে কিছু দিনের জন্য আমার মুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু সরকার তা নাকচ করে দেন। আমি গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলাম, বিনা প্রয়োজনে তাঁর শিবির থেকে কাউকেই বাইরে পাঠানো নিষেধ। এ সমস্ত শুনে 'বা'র করুণ হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হল। তিনি বাপুর কাছে গেলেন। বললেন, "সুশীলার যাওয়া দরকার তার মায়ের কাছে।" বাপু হেসে জিজ্ঞেস

করলেন, "সুশীলা গেলে তোমাকে দেখবে কে ?" "জানি আমার অসুবিধা হবে, কিন্তু ওর বুড়ো মায়ের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করবো না, তেমন স্বার্থপর নই আমি !" তারপর এলেন আমার কাছে, প্রায় হুকুমের সুরে বললেন, "সুশীলা, তোমার মা ও দাদার কাছে চিঠি লেখ।" "কিন্তু 'বা' আমি সরকারের কাছে লিখে জানিয়েছি যে কোন চিঠিই আমি লিখবো না। কেমন করে কথার খেলাপ করি বলুন তো ?"

তিনি বাপুর কাছে গিয়ে বললেন,—"সুশীলার সঙ্গে কথা বলে তাকে বাড়ীতে চিঠি লিখবার জন্য বলুন। কারো কাছে চিঠি লিখবেনা বলে যদি সরকারকে লিখে থাকে তাতে হয়েছে কি ? এমন দুর্ঘটনার কথা কি সে সময়ে কেউ ভাবতে পেরেছিল ? এরা ভাইবোন দুজনেরই এই দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে মা ও ভাইকে চিঠি লেখা একান্ত দরকার।" বাপু আমাদের ডেকে পাঠালেন। "আমার পরামর্শেই তোমরা স্থির করেছিলে জেল থেকে কাউকে চিঠি লিখবে না। এখন এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিহওয়ায় আমার মত হলো,—অন্ততঃ একবার তোমাদের মা ও ভাইকে চিঠি লিখে মনে শান্তি এনে দেওয়া দরকার।"

সেইদিন রাত্রিবেলায় আমরা দুজনেই বাড়ীতে চিঠি লিখলাম। জবাবে দাদা লিখলেন মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না। মাতৃহীন শিশুর তদারক করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপু 'বা' কে ঠাট্টা করে' বললেন,—"কি বাচ্চাটিকে আনিয়ে নেবো ? তুমিই যত্ন নেবে। কি বল ?" 'বা' জবাব দিলেন, "শরীরের বর্তমান অবস্থায় আমি বিশেষ কিছুই করতে পারবো না। কিন্তু সরকার যদি মেয়েটিকে এখানে আসতে দেয় তবে যতটুকু পারি খুশী হয়েই করবো।" গান্ধীজী সরকারকে লিখলেন, অবস্থা এমন যে বাড়ীতে

শিশুটিকে দেখবার কেউই নেই। গিয়ে যাতে একটা ব্যবস্থা করতে পারি সেজন্য আমাকে যেন নজরবন্দী—মুক্তি দেওয়া হয়। অথবা যেন শিশুটিকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। "সুশীলা যে শুধু ডাক্তার তা নয়, সে আমাদের নিজের মেয়ের মত। তার সামান্য কয়েকদিন অনুপস্থিতিও আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সবচেয়ে ভাল হয় যদি শিশুটিকে জেলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে খুশী মনেই আমরা সকল অসুবিধা স্বীকার করবো। অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তাকে নজরবন্দী অবস্থায় মুক্তি দেওয়া হয়।" সরকারের উত্তর এলো,—"অনুরোধ দুটির কোনটিতেই সম্মতি নেই।"

১৭

॥ অসুখ ॥

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বা'র অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হলো। নিঃশ্বাসের কষ্টে ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। নানাভাবে ছড়ানো গুটানো অথবা ইচ্ছামত নড়া চড়া করা যায় মত একটি খাট কিনতে পাঠালাম আমরা। তিনি যেমনটি চান যেন সেভাবে বসতে বা হেলান দিতে পারেন। কিন্তু অবস্থা দ্রুত খারাপের পথে। কয়েকটি দিনও অপেক্ষা সম্ভব নয়। আমরা তাঁর ছোট কাঠের টেবিলটি নিয়ে বিছানায় পায়ের দিকে রাখলাম। এই টেবিলে হাত রেখে তার উপর মাথা দিয়ে শুয়ে যেন ঘুমাতে পারেন। এ দৃশ্য মর্মস্পর্শী। 'বা'র মৃত্যুর পর এই টেবিলটি গান্ধীজী নিজের কাছে রেখেছিলেন। যেখানেই যেতেন সঙ্গে নিতেন। খাবার সময়ে 'খাবার-টেবিল' হিসাবে ব্যবহার করতেন।

দিনের পর দিন অবস্থা অবনতির দিকে চললো। অক্সিজেন আনতে পাঠালাম। প্রথম প্রথম নাকের মধ্যে নল দেওয়া তিনি অপছন্দ করতেন। কিন্তু পরে পরে নিজেই অক্সিজেন চাইতেন। ডাঃ গিল্‌ডার ও আমি সরকারকে লিখলাম যে ডাঃ বি. সি. রায় এবং ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌তাকে পরামর্শের জন্য আনানো দরকার বলে আমরা মনে করছি। ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌তা পুণায় রাজবন্দী ছিলেন। যারবাদা হাসপাতাল থেকে কয়েক মিনিটের জন্য একদিন বিকালে তাঁকে নিয়ে আসা হল আগা খাঁ প্রাসাদে। তিনি যখন এলেন তখন বাপুকে 'বা'র কাছে থাকতে দেওয়া হল না। দ্বিতীয় পরামর্শদাতা—চিকিৎসক হলেন ডাঃ বি. সি. রায়। তাঁকে আনানোই হলো না। দুবার চিঠি দিয়ে সে কথা সরকারকে মনে করিয়ে দিলাম, কিন্তু কোন জবাব এলো না।

অবস্থা যখন সঙ্গীন তখন সেবা-শুশ্রূষার জন্য আরো লোকের দরকার হলো। সেবিকার জন্য লিখায় সরকার একজন আয়াকে পাঠালে। সে কারাগারে থাকতেই পারলো না, এক সপ্তাহের মধ্যেই পালিয়ে গেল।

সেবিকার প্রয়োজন সম্বন্ধে লিখলাম আবার। সরকার আমাদের আত্মীয় স্বজনদের কাউকে আনিয়ে নিতে বলল। 'বা' কানু গান্ধী ও প্রভাবতীর কথা বললেন। প্রথম অনুরোধের কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের লম্বা লম্বা চিঠির ফল স্বরূপ সরকার ১২ই জানুয়ারী প্রভাবতীকে এবং ১লা ফেব্রুয়ারী কানু গান্ধীকে পাঠাল। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, সব শেষ হয়ে গেল।

গান্ধীজী সরকারকে লিখেছিলেন, 'বা' এবং অন্যান্য বন্দীদের যেন আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। অনেকদিন ধরে সে চিঠির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না সরকার।

কিন্তু যখন 'বা'র অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এলো তখন টেলিগ্রাম করে তাঁর ছেলে রামদাস গান্ধী ও দেবদাস গান্ধীকে ডেকে পাঠালে। তাদের দেখে 'বা' খুব খুশী হলেন। এই দেখা সাক্ষাৎ তাঁর রোগ যন্ত্রণা কমিয়ে দিল। আমরা বুঝলাম সপ্তাহে অন্ততঃ একদিনও যদি আত্মীয় বন্ধুজনের সঙ্গে 'বা' সাক্ষাৎ করতে পারেন তাহলে যে কোন ঔষধের চেয়েও বেশী উপকার হবে।

সাপ্তাহিক দেখা সাক্ষাতের পরামর্শ সরকার গ্রহণ করলো। প্রতি সপ্তাহে আসা তাঁর ছেলেদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় আত্মীয় স্বজনদেরও অনুমতি দেওয়া হল তাঁকে দেখতে আসার। সর্ত এই, সাক্ষাতের সময় বন্দীদের মধ্যে কেউই যেন উপস্থিত না থাকে। কিন্তু রোগীকে সেবিকা (নার্স) ছাড়া রাখা যাবে কেমন করে? কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হল। ফলস্বরূপ একজন নার্সকে কাছে থাকবার অনুমতি দেওয়া হল। তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রম অবনতি হওয়ায় একজন সেবিকা তথা নার্স যথেষ্ট নয়। আবার সরকারের কাছে লিখতে হল গান্ধীজীকে। অবশেষে, আদেশ এলো যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রয়োজন মনে করলে যত ইচ্ছা নার্স রাখতে পারেন।

'বা' ডিসেম্বরে বলেছিলেন একজন বৈদ্য এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসক ডাঃ দিন্‌শা মেহ্‌তার পরামর্শ নেবার জন্য। কিন্তু মৌখিক অনুরোধ সরকারের উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না। তাই গান্ধীজীকে আবার চিঠির মারফতে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চালাতে হল।

অবশেষে ৫ই ফেব্রুয়ারী ডাঃ দিন্‌শা মেহ্‌তা আসবার অনুমতি পেলেন। মৌখিক নির্দেশ এলো, যখন তিনি আসবেন একমাত্র

ডাক্তাররা ছাড়া আর কেউই যেন তখন 'বা'র কাছে উপস্থিত না থাকেন। এতে গান্ধীজীর অন্তর আহত হল। যখন এ নির্দেশ পৌঁছায় তখন তিনি স্নানে যাচ্ছিলেন। সাধারণতঃ গাত্র-মর্দনের সময় তিনি বিশ্রাম নিতেন, এমন কি ঘুমিয়েও পড়তেন। কিন্তু ঐ দিন তাঁর পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলালজীকে ডেকে পাঠালেন এবং স্নানাগারে শুয়ে শুয়েই সরকারে কাছে লিখবার জন্য চিঠির বিষয়বস্তু বলে গেলেন। উত্তেজনায় তাঁর হাত ও স্বর কাঁপতে লাগলো। "একজন মরণোন্মুখ মহিলার প্রতি এ রকম সর্ত আরোপ করা সরকারের পক্ষে অনুপযুক্ত! মনে করুন যখন ডাঃ দিন্‌শা মেহ্‌তা আসবেন তখন যদি রোগী 'বেড-প্যান' চান, কাছে নার্সরা না থাকলে কে তা দেবে? যদি আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হল তা কি আমাকে করতে হবে অন্যের মারফতে? এ এক অদ্ভুত অবস্থা! আমাকে প্রতি পদে ছুঁচ্ ফুটাবার চেয়ে অন্য কারাগারে পাঠিয়ে দিলেই ভাল করতেন সরকার। আমি দূরে থাকলে আমার স্ত্রী কোন সহায়তা আশা করবে না, আমি ও তাঁর যন্ত্রণার সময়ে অসহায় দর্শক হবার মানসিক ও দৈহিক দুঃসহ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবো!" সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নাড়া দিল এ চিঠি। মৌখিক আর এক নির্দেশ বিকালবেলায় পাওয়া গেল যে সকালে পাঠানো নির্দেশ বুঝতে ভুল হয়েছে। নার্সরা রোগীর কাছে থাকতে পারবে এবং গান্ধীজী রোগী সম্বন্ধে যখনই ইচ্ছা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। সরকারের কাছে এ বিষয়ে লিখবার কোন দরকারই ছিল না।

দিনে একবার করে 'বা'কে 'দেখবার জন্য ডাঃ দিন্‌শা অনুমতি পেলেন। 'বা'র ইচ্ছা দিনে দুবার আসুন ডাক্তার। আবার

গান্ধীজীকে লিখতে হল সরকারেব কাছে সে বিষয়ে অনুমতি চেয়ে। শেষে পাওয়া গেল অনুমতি।

ডিসেম্বর থেকে 'বা' বৈদ্যের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কর্ণেল ভাণ্ডারী, কর্ণেল শাহ্ এবং জেল-সুপারের কাছে বার বার অনুরোধ জানাতেন, যখন তাঁবা দেখতে আসতেন তাঁকে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে 'বা'র অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে পড়ল। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী একজন বৈদ্যকে পাঠাবার জন্য গান্ধীজী কর্তৃপক্ষকে জোর দিলেন। কারা কর্তৃপক্ষ জানালেন এতে তাদের হাত নেই, বম্বে সরকারকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন। বম্বে সরকাব জবাব দিলেন যে এতে তারাও কিছু করতে পাববেন না, কেন্দ্রীয় সরকারকে টেলিফোন কবে জিজ্ঞেস করবেন। এ ভাবে সময় বয়ে গেল। রোগী মৃত্যু শয্যায়, তখন ঘটছে এ সব। এমনি সমস্ত ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে গান্ধীজী সরকারকে একখানা কড়া চিঠি লিখলেন ১১ই ফেব্রুয়ারী। অবশ্য এ চিঠি ডাকে ফেলবার আগেই খবর এসে পৌঁছাল যে কেন্দ্রীয় সরকার ডাক্তারী পরামর্শের জন্য ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম অথবা 'নেচার কিওর' বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি যাকে দরকার তাকেই আনবার জন্য জেল-ডাক্তার কর্ণেল শাহ্‌কে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর দেরী না করে স্থানীয় যে কোন বৈদ্যকে নিয়ে আস্‌বার জন্য বললেন গান্ধীজী। সন্ধ্যাবেলাতেই যোশী নামে একজন বৈদ্যকে আনা হল। তিনি কিছু ঔষধ দিয়ে বলে গেলেন তাঁর চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় রোগীকে যেন অন্য কোন ঔষধ খেতে দেওয়া না হয়।

পরদিন লাহোরের বৈদ্যরাজ শিবশর্মা এসে পৌঁছালেন, রোগীকে তাঁর চিকিৎসাধীনে রাখা হল। মাঝ-রাতে রোগী ছটফট্ করতে

লাগলেন। ডাঃ গিল্‌ডার ও আমি অসহায়বোধ করছিলাম। বৈদ্যের চিকিৎসা চলা কালে আমরা কোন ঔষধই দিতে পারছিলাম না। তাই সুপারকে জাগিয়ে অনুরোধ করা হল রোগীর অবস্থা যেন বৈদ্যকে জানানো হয়। তিনি টেলিফোন করলেন বৈদ্যকে। রাতে রোগী দেখবার জন্য আসবার অনুমতি না থাকায় বৈদ্য টেলিফোন যোগেই মাথা টিপে দেবার ব্যবস্থাপত্র দিলেন। আমরা সবরকম চেষ্টাই করলাম কিন্তু উপকার কিছুই হলো না। সারারাত ধরে রোগী ঘুমাতে পারলেন না।

একদিন পর, তাঁর মনে হল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা যথেষ্ট হয়েছে এবং ডাঃ গিল্‌ডারকে বৈদ্যের ঔষধ আর না দিতে অনুরোধ জানালেন। আমরা বুঝালাম নূতন চিকিৎসাকে আরো কিছুদিন চালু রাখতে। ফোনে বৈদ্যরাজ ও তাঁকে ঔষধ ব্যবহার বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ জানালেন। অবশেষে 'বা' ঔষধ খেতে রাজী হলেন।

পরদিন তিনি এত ভাল বোধ করলেন যে সন্ধ্যার সময় চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে বারান্দা ঘুরে এলেন, তারপর মীরাবেনের কামরায় বালকৃষ্ণের ছোট্ট মন্দিরে গেলেন। নীচে বাগানে গান্ধীজী বেড়াতে গিয়েছেন। তিনি দেখলেন 'বা' চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে চলছেন। তিনি দেখতে এলেন তাঁকে। চোখ বন্ধ করে 'বা' বালকৃষ্ণের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করছেন। চোখ খুলতেই দেখলেন কামরার মধ্যে তাঁর সামনে গান্ধীজী। লজ্জার হাসি হেসে একটু বকলেন 'বা',—"আপনি এখানে এসেছেন কেন? যান্ বেড়ান গে'।" গান্ধীজী হাসলেন, আবার বাগানে ফিরে গেলেন।

আমাদের উত্তেজনার সীমা রইল না। খুশী হলাম আমরা। সমস্ত আবহাওয়াই আশায় ভরে গেল। একদিনের চিকিৎসাতেই

যদি এতটা ভাল ফল হয়, তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণ সারবার পথে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার পক্ষে এ হবে অলৌকিক কৃতিত্ব। এ উত্তেজনা বেশীক্ষণ রইল না। রাতে অস্থিরতা আবার ফিরে এলো। সুপারকে জাগানো হলো, তিনি বৈদ্যরাজকে ফোন করলেন। রোগীকে দেখবার জন্য বৈদ্যরাজকে আসবার অনুমতি দেওয়া হল। তিনি এসে একটা বড়ি খেতে দিলেন, ওতেই রোগী শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়লেন।

'বা'র অবস্থা এত বেশী খারাপ হলো যে যিনিই চিকিৎসা করুন না কেন, দিনরাত রোগীর কাছে তাঁর থাকা দরকার মনে করলাম। রাত্রিবেলা আগা খাঁ প্রাসাদে বৈদ্যকে থাকতে সরকার অনুমতি দেবে না। তিনি রাস্তার উপর গাড়ীতে ঘুমাতে রাজী হলেন যাতে প্রয়োজনের সময় দেরী না করে চলে আসতে পারেন। কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আমাদের সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনদিন ধরে বৈদ্যরাজজী আগা খাঁ প্রাসাদের দুয়ারের কাছে গাড়ীতে ঘুমিয়ে কাটালেন। এতেও কোন কাজ হলো না, দরকারের সময় চট্ করে ডাকা গেল না। প্রথমে সেপাইকে জাগাতে হবে, সে জাগাবে জমাদারকে, জমাদর জাগাবে সুপারকে, তাঁর কাছ থেকে দরজার চাবি নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বৈদ্যকে ভিতরে আনবে। সুপার তাঁকে নিয়ে আসবেন রোগীর কাছে, যতক্ষণ বৈদ্য থাকবেন তিনিও ততক্ষণ তার সঙ্গে থাকবেন। তারপর ফটক পর্যন্ত ফিরে পৌঁছে দিয়ে ঘুমাতে যাবেন আবার। এ সমস্ত কাণ্ডকারখানা গান্ধীজীর মনে বিপর্যয় আনলো। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, বৈদ্যের গাড়ীতে ঘুমানোর তৃতীয় দিন। রাত ১২'৩০ মিঃ, তাঁকে ডেকে আনা হলো, ১'৩০ মিনিটে তিনি ফিরে গেলেন। গান্ধীজী বিছানায় শুয়ে জেগে ছিলেন। ২টার সময় তিনি উঠলেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে

চিঠিতে লিখলেন যে বৈদ্যরাজকে প্রাসাদের মধ্যে ঘুমাবার অনুমতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন রাত্রিকালে সমস্ত শিবিরকে বিরক্ত করা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। যদি পরদিন রাত্রিবেলা থেকে সে অনুমতি দেওয়া না হয় তাহলে বৈদ্যের চিকিৎসা তিনি বন্ধ করে দেবেন। ডাক্তারের চিকিৎসা প্রায় বন্ধই করা হয়েছে। যা-ই ঘটুক, রোগী বিনা চিকিৎসাতেই থাকবে।

চিঠির প্রার্থিত ফল ফললো। অনুমতি পাওয়া গেল। পরদিন রাত্রিবেলা বৈদ্যরাজ 'বা'র বারান্দায় শুলেন, দুতিনবার উঠে দেখে গেলেন তাঁকে। ঘুমাবার ঔষধ দেওয়ায় অন্য রাতের চেয়ে অনেক ভাল ভাবেই কাটলো তাঁর।

১৮ই ফেব্রুয়ারী আবার খুব অস্থিরতা দেখা দিল। বৈদ্যরাজ সারাদিন বিশেষ একরকম ঔষধ খুঁজে খুঁজে নগর ঘুরে বেড়ালেন। বহু ঔষধ দিয়ে চেষ্টা করলেন কিন্তু অস্থিরতা বেড়েই চললো। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটালেন। সামান্য জ্বর ও দেখা দিল সে সঙ্গে। ঔষধের ফলে সামান্য পায়খানাও হল কিন্তু প্রস্রাব হল না কিছুতেই। ১৯শে, বৈদ্যরাজ গান্ধীজীকে সকালের প্রার্থনার পর বললেন তাঁর যা সাধ্যের মধ্যে ছিল তা করা হয়েছে, কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে বললেন, "আমার মনে হয় এখন ডাক্তারদের সুযোগ দেওয়া দরকার, যদি কিছু করতে পারে।"

আগের দিন গান্ধীজী আমাকে বলেছিলেন, "আগামী কালের মধ্যে রোগীর কোন উন্নতি যদি দেখা না যায়, বৈদ্য সম্ভবতঃ চলে যাবে। পরের ব্যবস্থাপনা যদি তোমাকে করতে হয় তাহলে আমার পরামর্শ হবে সকল রকম ঔষধই বন্ধ রাখাএবং একমাত্র রামনামের উপর ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু সেও সম্ভব যদি তুমি ও ডাঃ গিল্ডার আমার কথা সর্বান্তকরণে মেনে নিতে পার।"

১৭ই বিকালে 'বা'র বড় ছেলে হরিলাল গান্ধী তাঁকে দেখতে এলেন। যখন শুনলেন মাত্র একবারের জন্য অনুমতি পেয়েছেন, 'বা' খুব রেগে গেলেন। "দুভাইয়ের মধ্যে কেন এ পার্থক্য? দেবদাসকে প্রতিদিন আসবাব অনুমতি দিল আর হরিলালকে বললো শুধু একটিবাব মাত্র আসতে? আসুন ভাণ্ডারী (কারা-অধিকর্তা), তাকে জিজ্ঞেস করবো কেন গরীব ছেলে মাকে ইচ্ছামত দেখতে আসতে পাববে না ধনীছেলের মত?" এ কথায় গান্ধীজী তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন,—"সে যাতে প্রত্যেকদিন আসতে পারে আমি সে অনুমতি আনিয়ে নেবো।" অনুমতি পরদিনের জন্য পাওয়া গেল। কিন্তু হরিলালেব পাত্তা পাওয়া গেল না। 'বা' প্রতিটি দিন তার কথা জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলেন যে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯শে 'বা'ব অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়ল। আমাদের জানানো হলো সবকাব বামদাস ও দেবদাস গান্ধীকে আসবাব জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে এবং হরিলাল গান্ধীকে খুঁজছে।

১৮

॥ অন্তিম মুহূর্ত্ত ॥

১৯শে সমস্তরাত ধরে 'বা'কে অক্সিজেন দেওয়া হল। মোটামুটি ভাল ঘুম ঘুমালেন। কিন্তু ২০শে ভোর ৫টা থেকে অত্যন্ত অস্থির হলেন। প্রতি মুহূর্তে 'রাম, হে রাম' বলে কাতরোক্তি করতে লাগলেন।

সে অস্থিরতা দেখে আমাদের সাহস স্তিমিত হলো। গান্ধীজী

এলেন, বিছানার উপর বসলেন। 'বা' তাঁর কাঁধের উপর হেলান দিলেন এবং তাতে কিছু পরিমাণ আরাম পেলেন। তিনি যখন ঐভাবে বসলেন তখন প্রভাতী প্রার্থনা চললো। তারপর আমরা সকলেই পালা করে করে তাঁর কাছে বসে ভজন অথবা রামধুন গাইলাম। যখন গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন গ্রামোফোন বাজালাম। 'দুঃখে ও সুখে শ্রীরাম ভজ (শ্রীরাম ভজো দুখমেঁ সুখমেঁ)' গানটি 'বা'র খুব প্রিয় ছিল। এ গান শুনতে শুনতে তিনি যন্ত্রণা ভুলে গেলেন। ৯টা ১৫ মিনিটের সময় এক মাত্রা ক্লোরাল ও ব্রোমাইড দিলাম। এরপর দেড়ঘণ্টাতক ঘুমালেন। যখন জাগলেন কিছুটা ভালবোধ করলেন। উঠে বসে দাঁত মাজলেন এবং মুখ ধুলেন। এমনভাবে একাজ করলেন, দেখে অবাক হলাম! কোথায় পেলেন এ শক্তি? এরপর সামান্য 'চা' পান করে শুয়ে পড়লেন।

প্রায় সমস্তদিন গান্ধীজী তাঁর শিয়রের কাছে বসে কাটালেন। তাঁর নৈকট্য 'বা'কে অদ্ভুত মানসিক শান্তি দিল। বাপু আমাকে ও ডাঃ গিল্ডারকে ডেকে পাঠালেন। "সব ওষুধই বন্ধ করে দাও এবার। এখন রামনামই পরম ফলপ্রদ প্রতিকার। আরো বলছি, একমাত্র জল ও মধু ছাড়া অন্য সব খাবার ও বন্ধ করে দাও। যদি খাবার চান তখন দেখা যাবে কি করা যায়। ওষুধে আমার বিশ্বাস নেই। আমার ছেলেদের কঠিন অসুখেও আমি ওষুধ খেতে দেইনি। কিন্তু 'বা'র বেলায় এই নিয়ম আমি চাপাইনি। আজ সে নিজেই ওষুধ খেতে রাজী নয়। রামনাম ছাড়া তাঁর শান্তি নেই। আজ সকাল থেকেই তাঁর মুখে রাম নাম ছাড়া আর কিছু শুনিনি। এ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য, কিন্তু এইই আমি ভালবাসি। তাঁর এ রকম মানসিক অবস্থায় ওষুধ আমি বন্ধ করেই দিতাম। যদি এইই ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়,

তিনিই তাঁকে বাঁচাবেন, না হয় আমি তাঁকে যেতো দেবো, কিন্তু কোনমতেই আর ওষুধ দেবো না।

২০শে সকাল, গান্ধীজী জোর দিয়ে বললেন যে আমার বাইরে যাওয়া এবং বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে আসা দরকার। হেঁটে বেড়িয়ে যখন ফিরলাম গান্ধীজী তখন 'বা'র বিছানায় বসেছিলেন। হঠাৎ 'বা' সটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শ্বাস কষ্টের জন্য বহু মাস ধরে তিনি সেভাবে ঘুমাতে পারেন নি। আমরা ভয় পেলাম, দেবদাস ভাইকে আনবার জন্য লোক পাঠালাম। তিনি লেডী থ্যাকারসের বাড়ীতে ছিলেন এবং বিনিদ্র রাত্রির পর মাত্র ঘুমাতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি চলে এলেন। মনুও এলো ঠিক সময়। ডাঃ মেহতাও ফিরলেন একই সময়ে। বাপু জিজ্ঞেস করলেন 'বা' ভজন বা রামধুন শুনতে চান কি না। তিনি বললেন, "না"। বাপুজী আমাদের বললেন পাশের ঘরে বসে আস্তে আস্তে গীতা আবৃত্তি করতে যেন এ ঘরে শুয়ে 'বা' শুনতে পান। কানু, দেবদাসভাই, প্যারেলালজী এবং অন্যান্যেরা একের পর এক গীতা সুর করে পড়তে লাগলেন।

২০শে রাত্রিবেলা, আমি রাত ২টার সময় শুতে গেলাম ডাঃ দিন্শাকে রোগীর দায়িত্ব দিয়ে। সকালে শুনলাম ভোর ৪টায় তাঁর নাড়ী খুব ক্ষীণ হয়ে পড়ে, ডাঃ গিল্ডারকে ডাকতে হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম ডাঃ গিল্ডার 'বা'র পাশে চেয়ারে বসে আছেন। 'বা' আবার এক মাত্রা ক্যাষ্টার অয়েল চাইলেন। ডাঃ গিল্ডার তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছিলেন এই বলে,—"জোলাপ আপনাকে আরো দুর্বল করে ফেলবে 'বা', আপনার খাওয়া উচিত হবে না।"

"তা'তে কি আসে যায়? যে ভাবেই হোক আমার অন্তিম

সময় এসে গেছে।" জবাব দিলেন 'বা'। ধরা গলায় গিল্ডার বললেন, "এসব কি বলছেন 'বা'? আপনার ছেলেরা আসছে আপনাকে দেখতে। দেবদাস এসে পড়বে আজই। রামদাস আসবে আগামীকাল। আপনাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

ছেলেদের নাম শুনে 'বা' হাসলেন। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন "কেন, তাদের ডাকতে পাঠিয়েছ কেন? তোমরা সকলেই তো আমার ছেলে। নও কি? যদি মরি, তোমরাই আমার সৎকার করবে। রামদাস সম্বন্ধে বলছি, তাকে আসতে বলবে না। যাতায়াতের খরচ অনেক, তাছাড়া আজকাল রেলগাড়ীতে ভীড় ভীষণ।" 'বা'র চার ছেলের মধ্যে রামদাসই সবচেয়ে দুর্বল, সেজন্য তার প্রতি সব সময়েই ছিল বেশী স্নেহ।

'বা' হরিলালের কথা প্রতিদিন জিজ্ঞেস করছিলেন। সকলেই তাঁকে খুঁজছিলেন, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে, ২০শে ফেব্রুয়ারী স্বামী আনন্দ তাকে খুঁজে পেতে সফল হলেন। হরিলাল ভাই সুপারকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন যে বিকাল বেলায় খুব বেশী ঘুমিয়েছিলেন বলে' আসতে পারেন নি। পরের দিন আসবেন দিনের বেলাতেই। আমরা সকলেই বুঝলাম বিকালবেলা তার অতিরিক্ত ঘুমাবার অর্থ। 'বা' কুপিত হলেন। গান্ধীজী শান্ত করলেন তাঁকে। শেষটায়, ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকালবেলা হরিলাল ভাই এলেন। তাঁকে মাতাল অবস্থায় দেখে 'বা' কপালে করাঘাত করতে লাগলেন। তাঁর চোখের সামনে থেকে হরিলালভাইকে সরিয়ে নিতেই হল।

ঐ উত্তেজনা বুকে যন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। সেদিন সকালে ক্যাষ্টর অয়েলের জন্য জিদ্ ধরলেন। তাই গান্ধীজীর অনুমতি নিলাম

বুকের যন্ত্রণায় কিছু ঔষধ দেব কি না। উত্তরে বললেন অন্যান্য কথা বলতে পারবেন না তবে 'বা' ক্যাষ্টর অয়েলের জন্যই জিদ ধরেছেন। "যা দিলে ভাল হবে মনে কর, তাই দাও।" আমি ব্যথার ঔষধ দিলাম এবং রামধুন গাইতে সুরু করলাম। তিনি আরাম পেলেন, মন দিয়ে শুনতে লাগলেন।

১৯

॥ মহাপ্রয়াণ ॥

রাত্রিবেলা গান্ধীজী অনেকবার আসতেন 'বা'কে দেখবার জন্য।

কিন্তু 'বা' তাঁকে বেশীক্ষণ কাছে বসিয়ে রাখতে চাইতেন না। দিনেব বেলায় তিনি আসতেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে বসতেন। জীবনের অন্তিম ক্ষণগুলোতে তিনি বিছানায় হেলান দিয়ে বসবার চেয়ে কারো গায়ে হেলান দিয়ে বসাটাই পছন্দ কবতেন বেশী। গান্ধীজী যখন বিছানায় বসতেন, তাঁর গায়ে হেলান দিতেন। ডা: গিলডার আমায় বললেনঃ "খুব সাবধান, নিউমোনিয়া ছোঁয়াচে রোগ। বাপুর মুখ 'বা'র এত কাছে যে তাঁর নিঃশ্বাস থেকে ফুসফুসে নিউমোনিয়া বীজাণু শরীরে নিশ্চয়ই ঢুকছে। এ ভাল কথা নয়। এতক্ষণ ধরে তাঁর এভাবে বসাটা ঠিক হবে না মনে করছি।" কিন্তু সে বিষয়ে কে তাঁকে বলতে যাবে?

দুর্বলতা বাড়তে থাকায় মুখের থুথু ঠোঁট থেকে মুছে নেওয়া প্রয়োজন হয়েপড়ল। নার্স এজন্য ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার করতো, তারপর ফেলে দিত। মৃত্যুর তিন চারদিন আগে, রাত্রিবেলা যখন গান্ধীজী

এলেন দেখলেন নার্স ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার করছে। তিনি এজন্য রুমাল তৈরী করবার প্রস্তাব করলেন। পরদিন মনু চারখানি নূতন রুমাল তৈরী করে আনে। দিনে অথবা রাত্রে, যখনই গান্ধীজী 'বা'র বিছানার কাছে আসতেন, ময়লা রুমালগুলো নিয়ে যেতেন ও ধুতেন। প্রথমদিন আমি মধ্যস্থ হয়ে বললাম, "বাপু, অনুগ্রহ করে রুমালগুলো ফেলে রাখুন, আমরাই ধুয়ে দেবো।" তিনি জবাব দিলেন, "আমাকে করতে দাও, এ করতে ভালবাসি আমি।"

একদিন দুপুরের খাওয়া সেরে গান্ধীজী 'বা'র খাটে বসবার জন্য গেলেন। 'বা'র ঘুম আসছিল। যদি বাপুর কাঁধে ভর দিয়ে ঘুমান তাহলে জেগে না ওঠা পর্যন্ত একঠাঁই বসে থাকতে হবে বাপুকে। ফলে দুপুরের বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হবেন বাপু। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, আমি সে সময়ে তাঁকে বিশ্রামের কথা বললাম। "বিশ্রাম সেরে তারপর 'বা'র কাছে আসুন না কেন?" তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নিজের আসনে বসে আমায় বললেন, "ওভাবে আর কিছুক্ষণ বসতে দিলে কিই বা ক্ষতি হতো?" কেন বসতে মানা করেছিলাম তার কারণ সব বললাম বটে কিন্তু নিজেকে অসুখী মনে হচ্ছিল। দিন কয়েকের জন্য গান্ধীজী যদি নিজের বিশ্রাম বিসর্জন দেন তাতে কিইবা আসে যায়? যে জিনিস তাঁর মনে শান্তি আনবে এমন কিছুর পথে বাধা স্বরূপ হয়ে কেউ দাঁড়াবেই বা কেন?

এ সকল পটভূমিকা বিচার করে নিউমোনিয়া সংক্রামিত হবার ভয়ে আমি কেমন করে বলবার সাহস করবো যে জীবনের অন্তিমক্ষণে বাপু যেন না বসেন 'বা'র কাছে? ডাঃ গিল্ডার আমার মানসিক বিচার বুঝতে পারলেন। "বেশ, তাঁকে বসতে দিতে আপত্তি করবো না কিন্তু মুখ খুব কাছে আসতে দেবো না," বললেন। কিন্তু সেটুকুও বলতে কারো সাহস হলো না। মনে হল

সবচেয়ে ভাল হবে নীরব থাকা। ডাঃ গিল্ডারও অবশেষে সমর্থন করলেন আমাকে। "হাঁ, তিনি যা চান তাইই করতে দেওয়া হোক। বাষট্টি বৎসর পরস্পরের সঙ্গী ছিলেন, আজ দেখছেন বিচ্ছেদের সময় এগিয়ে আসছে। কি করে নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন? আর আমরাই বা তাঁকে সেকথা বলি কি করে?" বলতে বলতে তাঁর নিজের চোখ জলে ভরে এলো।

অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে একদিন 'বা' গান্ধীজিকে বললেন একবার জল-চিকিৎসা করিয়ে দেখতে। এমনিতেই প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রতি গান্ধীজীর খুব আগ্রহ ছিল। 'বা'র কথায় পরদিন থেকেই কোমর পর্যন্ত একবার ঠাণ্ডা ও আবার গরম জলে ডুবিয়ে এবং বসিয়ে তিনি নিজে 'বা'র চিকিৎসা সুরু করলেন। প্রত্যেকদিন বিকালে প্রায় এক ঘণ্টা এভাবে কাটাতে লাগলেন। ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একদিন 'বা' বললেন, "এবার আপনি যান, নিজের বহু কাজ পড়ে আছে তাতে মন দিন, সুশীলা আমাকে স্নান করাবে।" "আমার কাজকর্মের জন্য ব্যস্ত হয়ো না," জবাবে একথা বলে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একদিন মুখ থেকে বেরিয়ে গেল যে তাঁর সময়ের অকুলান হচ্ছে। বললাম, "বাপু, আপনি জানেন 'বা'র সেবা করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। এই এক ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে আপনি তা ইচ্ছামত কাজে ব্যয় করতে পারেন।" "জানি, 'বা'র জন্য যে কোন কাজই তুমি করতে প্রস্তুত কিন্তু জীবন সায়াহ্নে ওঁর সেবা করবার দুর্লভ সুযোগ ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন, একে অতি মূল্যবান বলে মনে করি। যতদিন 'বা' আমার সেবা গ্রহন করবে ততদিন এইটুকু সময় আনন্দে ব্যয় করবো,"—উত্তর দিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী, সকাল সাড়ে ছটার সময় দেবদাস গান্ধী, মনু

(শ্রীহরিলাল গান্ধীর মেয়ে) এবং সনতোকবেন আগা খাঁ প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে 'বা' অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেললেন। হরিলাল ভাইকে মাতাল অবস্থায় দেখার দুঃখ তিনি ভুলতে পারেননি। দেবদাস ভাই্কে ডেকে বললেন, "পরিবারের ভার তোমাকেই বইতে হবে। বাপু সন্ত পুরুষ। তাঁকে সমস্ত পৃথিবীর কথা ভাবতে হবে। আর হরিলালের কথা সবই তো তুমি জান। তাই পরিবারবর্গের দেখাশোনা তোমার কপালেরই লেখা।"

মনু মন্ত্র-গান করলো, 'বা' খুব পছন্দ করলেন সে গান। রাত্রিবেলা মনু ও সন্তোকবেন তাঁর কাছে থাকুক, 'বা'র ইচ্ছা তা। কিন্তু সরকার সে অনুমতি দেবে না। দেবদাস ভাই মায়ের কাছে থাকার অনুমতি পেয়েছেন। তিনি ওদের সকলকে বিদায় দেবার জন্য গেলেন। আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে 'বা' ঘুমবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঐ ঘুম আমার ভাল মনে হলো না। এ সতেজ ভাব আনবার স্বাভাবিক ঘুম নয়। প্রস্রাব অবদমনের ফলেই এ ঘুম ঘুম ভাব। সাড়ে এগারোটার সময় প্রভাবতী এসে আমায় ছুটি দিলেন। 'বা' তাঁকে বললেন, "এসো, দুজনেই শুতে যাই।" বিছানাতেই শুয়ে আছেন একথা ভুলে গিয়েছেন কোন সন্দেহ নেই। কথা বলা মাত্রই কাশি দেখা দিল। শেষ সময় উপস্থিত। দেবদাস-ভাই তাঁর খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে সেবা করতে লাগলেন। আচ্ছাদন-ঢাকা টেবিল ল্যাম্পের কাছে মেঝেতে বসে আমি 'বা'র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডায়েরী লিখছিলাম। মাথা ধরেছে বলছিলেন তিনি। দেবদাসভাই ধীরে ধীরে মাথা টিপে দিতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হল 'বা' ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই মাথা টিপে দেওয়া বন্ধ করলেন। হঠাৎ 'বা' চেঁচিয়ে উঠ্লেন, "সুশীলা, তুইও ক্লান্ত হয়ে পড়লি?" "না, 'বা', আমার ক্লান্তির কোন কারণই

নেই," বলে আমি তাঁর মাথা টিপে দিতে আরম্ভ করলাম।। মানসিক বিশৃঙ্খলতার চিহ্ন দেখা গেল। রাত ২টার সময় ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ২'৪৫ মিনিটে আমি গেলাম শুতে। ৫টা পর্যন্ত দেবদাসভাই তাঁর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে দ্রুত। দেবদাসের মুখ গম্ভীর, কোমল ও স্নেহশীল দেখাচ্ছিল। তার চোখের সামনে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামরত তার মা, ঐ ক্ষীণতনু ছোট্ট নারীর জন্য যে গভীর ভালবাসা ও উদ্বেগ,—তা-ই এই রূপান্তরের জন্য দায়ী।

২২শে সকাল, আমি সকাল ৭টায় উঠে হাত মুখ ধোয়ার জন্য গেলাম। 'বা'র স্নানঘরের পাশে আমি মুখ ধুচ্ছি, 'বা' চীৎকার করে ডাকলেন,—"সুশীলা!" আমি তার বিছানার কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে 'বা'?" "সুশীলা, আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, আমার যত্ন কর,"— বললেন। তাঁর শিয়রের কাছে দেয়ালে "হে রাম" লেখা ছবিটির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললাম, 'বা' আপনি আপনার নিজের ঘরের মধ্যে রয়েছেন, ঐ তো আপনার প্রিয় ছবিটি।" এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বললেন, "আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, আমাকে বাপুর ঘরে নিয়ে যা—!" ভাবলাম তিনি গান্ধীজীকে দেখতে চান। পাশের কামরায় বাপু জলযোগ করছিলেন। বেড়াতে যাবার আগে তিনি যেন 'বা'র কাছে আসেন, বলে পাঠালাম।

আমার কোলে মাথা বেখে শুয়েছিলেন 'বা'। হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুশীলা, আমি কোথায় যাচ্ছি? আমি কি মরে যাচ্ছি?" অতীতে যখনই 'বা' এ ধরণের কথাবার্তা বলেছেন আমি সব সময়েই অনুরোধ করেছি চিন্তা থেকে বিষণ্ণ ভাব দূর করতে। "ওভাবে কথা কেন বলছেন? আমরা সকলেই

এখান থেকে বাড়ী যাবো 'বা',—বলতাম এ কথাই। আজ সেকথা বলবার হৃদয় আমার ছিল না! তাই উত্তর দিলাম, "বা', আমরা সক্কলেই একদিন না একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে যাবো। কেউ আগে আর কেউ পরে। কখন যাবো তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে?" বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক।" তারপর চোখ বন্ধ করে আবার আমার কাঁধের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন।

একটু পরে গান্ধীজী এলেন। কিছুক্ষণ 'বা'র পাশে দাঁড়ালেন, মাথায় হাতে টোকা দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এখন একটু বেড়াতে যাবো কি?" অতীতে কখনোই অল্প সময়ের জন্যও 'বা' বেড়ানোর কালে বাপুকে কাছে থাকতে দেন নি। সব সময়েই বলতেন বেড়াতে অথবা, ঘুমাতে যেতে, অথবা নিজের কাজকর্ম করতে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেদিন যখন জিজ্ঞেস করলেন যাবেন কিনা, 'বা' বললেন 'না'! তাই তিনি বিছানার উপর বসলেন। বাপুর বুকের উপর মাথা রেখে এবং গায়ে হেলান দিয়ে, নীরবে শুয়ে পড়লেন চোখ বন্ধ করে। দুজনের মুখে অনির্বচনীয় শান্তি এবং তৃপ্তি! স্বর্গীয় দৃশ্য। শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে আমরা সকলেই নিঃশব্দে সরে গেলাম। ১০টা পর্যন্ত গান্ধীজী তাঁকে নিয়ে বসে রইলেন। প্রতিক্ষণেই তিনি 'বা'কে বলছিলেন রামনামের আশ্রয় নিতে। কাশলেই সঙ্গে সঙ্গে হাত বুলিয়ে তাঁর ব্যথা লাঘবের চেষ্টা করছিলেন।

দেবদাসভাই, প্যারেলালজী ও আমি পাশের ঘরে জলখাবার—টেবিলে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। কোন এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী দেবদাস ভাইকে বুঝিয়ে বলছিলেন কেন সরকার 'বা'কে মুক্তি দিচ্ছে না, সে সব কথাই তিনি আবার আমাদের কাছে বর্ণনা করছিলেন। সে ভদ্রলোক নাকি বলছিলেন, "ধরুন আমরা তাঁকে

মুক্তি দিলাম এবং তারপর অবস্থা যদি আরও সঙ্গীন হয় তখন কি হবে ? তখন আপনার বাবাকেও মুক্ত করে দেবার দাবী আসবে। এবং যদি তাঁকে আমরা ছেড়ে না দি' তাহলে আমাদের বলা হবে 'হৃদয়হীন জানোয়ার।'

বেলা ১০টা। 'বা' গান্ধীজীকে ছেড়ে দিলেন। আমিই তাঁর বদলে বসলাম। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন। এই প্রথম আজ তিনি মুখ ধুলেন না। বোরোগ্লিসারিন দিয়ে তাঁর মুখ পরিস্কার করে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এমন কি তাও তিনি চাইলেন না।

গতরাত থেকেই কিছু গিলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। জলটি পর্যন্ত না। দেবদাস গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন, তাতে তুলসীপাতা দিলেন। বাপু বললেন, "দেবদাস তোমার জন্য গঙ্গাজল এনেছে। 'বা' হা করলেন, বাপু এক চামচ ঢেলে দিয়ে বললেন, "আরো খাও।" 'বা' চোখ বন্ধ করে মাথা এলিয়ে দিলেন আবার। 'হে রাম', বলার সঙ্গে সঙ্গে 'বা' গঙ্গাজীকেও ডাকতেন। গঙ্গাজল পান তাঁর মনে খুবই শান্তি এনে দিল।

স্নানের পর হাল্‌কা কিছু খেয়ে গান্ধীজী আবার 'বা'র পাশে এসে বসলেন। দর্শনার্থীরা আসতে আরম্ভ করলেন। আগতদের 'বা'র কাছে বসবার সুযোগ দেবার জন্য তিনি বিছানা ছেড়ে মেঝেতে বিছানো মাদুরে গিয়ে বসলেন। কিছু পরে সন্তোকবেন, কেশু ভাই ও রামিবেন এলেন। 'বা' উঠে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সন্তোকবেনকে বললেন: "আমার জন্য দেবদাসের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সে অক্লান্ত সেবা করেছে।" দেবদাস ভাইকে বললেন: "তুমি আমার সেবা করেছ যথেষ্ট, এখন পরিবারের প্রতি কর্তব্য কর।" "তোমার জন্য কিই বা করেছি আমি 'বা'," দেবদাসভাই জবাব দিলেন। "আমি গতরাত্রে মাত্র

এসেছি, তোমার সেবা যাঁরা করেছেন তারা তোমার এখানকার সঙ্গিনীরা।" কিন্তু শেষ সময়ে দেবদাস উপস্থিত রয়েছে কাছে, এতেই তাঁর প্রচুর আনন্দ।

"রামদাসভাই আসছেন 'বা,'" দেবদাস ভাইয়ের এ কথা শুনে বললেন, "কেন আসছে সে ?" রামদাসের কোন অসুবিধা হবে এ চিন্তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

বাপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার মৃত্যুর পর দুঃখ করবেন না। তা যেন আনন্দের কারণ হয়।" তারপর দুচোখ বন্ধ করলেন এবং হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "প্রভু, আমি জন্তুর মত নিজের পেট ভরিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর। তোমার করুণা প্রার্থনা করছি। তোমার ভক্ত হতে চাই, তোমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে চাই ভালবাসতে। আর কিছু চাই না।"

বিকাল সাড়ে ৫টায় কর্ণেলশাহ্ এবং কর্ণেল ভাণ্ডারী গান্ধীজীর মত জানতে এলেন 'বা'কে পেনিসিলিন দেওয়া সম্বন্ধে। তিনি বললেন, "দিন, যদি সুশীলা এবং ডাঃ গিল্ডারের ও সেই মত থাকে—।" এ ব্যাপারে গান্ধীজীর কি ইচ্ছা ডাঃ গিল্ডার তা জানতেন। তিনি পেনিসিলিনের প্রতি আগ্রহ দেখালেন না। দেবদাস ভাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললাম। প্রশ্নটির দুটো দিক আছে। বাপুর মত হল ঈশ্বরের উপর তাঁকে নির্ভর করতে এবং শান্তিতে ইহলোক ত্যাগ করতে দেওয়া। যিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা ঔষধ দিয়ে তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? এ বক্তব্যে যুক্তি ছিল। অন্যদিকে আবার, কেউ কেউ অনুভব করলেন, জীবন থাকতে আশা ছেড়ে দেওয়া কেন ? তাঁকে বাঁচাবার জন্য আমাদের চেষ্টা চলুক না কেন ? এ ধরণের যুক্তি নির্লিপ্ত বিজ্ঞানীর। দেবদাসভাই শেষোক্ত দলের, আর আমিও ভাবছিলাম সে দৃষ্টি কোন

থেকে। ডাঃ গিল্ডার বাপুকে বললেন যে আমরা সকলেই পেনিসিলিন দেওয়া সম্বন্ধে একমত। সকল দিক বিচার করে তিনি যদি তা অনুমোদন করেন তবেই তা দেওয়া হবে। ডাঃ গিল্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী আমি সিরিঞ্জ ও সূঁচ সেদ্ধ করতে গেলাম। গান্ধীজী ডাকলেন আমাকে, "তোমরা কি ঠিক করলে?" উত্তরে "তাঁকে আমরা পেনিসিলিন দেবো।" বললাম, তুজনেই কি বিশ্বাস কর এ দেওয়া দরকার?"—তিনি আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। "তোমরা কি নিশ্চিত যে ওতে 'বা'র ভাল হবে? আমি 'হাঁ' বলতে পারলাম না। এ এক পরীক্ষা বটে। রোগী একরকম প্রায় মরমর অবস্থায়। কি করে আমি বলতে পারি পেনিসিলিন অথবা তার ফলে তাঁর কোন উপকার হবে কি না? "আপনি একবার এ বিষয়ে ডাঃ গিল্ডারের সঙ্গে কথা বললে ভাল হয় বাপু," এ উত্তর দিয়ে আমি চলে এলাম।

গান্ধীজী ডেকে পাঠালেন ডাঃ গিল্ডারকে। তিনি তারপর এলেন আমার কাছে। বললেন, গান্ধীজী জানতেন না যে পেনিসিলিন দেওয়া হবে ইনজেকশান করে। পেনিসিলিন দেওয়ার অর্থ, তিনঘণ্টা অন্তর ইনজেকসান দেওয়া জানতে পেরে তিনি মানা করলেন 'বা'কে দিতে। আমি জল ফুটাবার পাত্র থেকে সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে কাগজে মুড়ে রাখলাম। মনে আমার নিরাশা এবং স্বস্তি তুই-ই তখন একসঙ্গে।

গান্ধীজী দেবদাস ভাইয়ের সঙ্গে সওয়াল-জবাব করছিলেন,—"ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখছ না কেন? এমন কি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত তোমার মাকে কেন ওষুধ দিতে চাইছ?" এ সমস্ত আলোচনায় তাঁর বেড়ানোর দেরী হয়ে গেল। প্রতিদিন ঠিক সাড়ে ছটায় তিনি বাগানে নেমে যেতেন। আজ এ সমস্ত কথাবার্তায় ৭।১৫ মিনিট হওয়া সত্ত্বেও তিনি তখনো দোতালায়। অবশেষে

স্নান ঘরে গেলেন বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হতে। ঠিক সে মুহূর্তে 'বা' ডেকে উঠলেন "বাপু!" প্রভাবতী বসেছিলেন 'বা'র কাছে। বাপু এলেন, বিছানার উপর তাঁর পাশে বসলেন! কানুকে মানা করলেন কোন ফোটো তুলতে। 'বা' ও বাপুর একসঙ্গে ফোটো তুলবার জন্য কানুর আকাঙ্ক্ষা ছিল। নিরাশ হল সে, সে সঙ্গে আমরাও।

'বা'র অস্থিরতা অত্যন্ত বেশী হল। দুবার তিনি উঠে বসলেন, আবার শুয়ে পড়লেন। বাপু জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে? তোমার কি রকম মনে হচ্ছে?" অজ্ঞাত কিছুর কিনারায় দাঁড়ানো নিষ্পাপ শিশুর মত তিনি অস্ফুট উচ্চারণে বললেন, "আমি জানি না।" 'বা'র ঘরের সামনের বারান্দায় গিয়ে কানু ও আমি অসন্তোষ প্রকাশ করছিলাম গান্ধীজী' কানুকে 'বা'র সঙ্গে নিজের ফোটো তুলতে না দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে।

ঠিক সে সময়ে 'বা'র ভাই মাধবদাস এলেন। 'বা' তাঁকে চিনতে পারলেন। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াল, কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। বারান্দা থেকে আমি ঘরে এলাম। শেষ বারের মত বসতে চেষ্টা করলেন 'বা'। কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে নিরস্ত করলেন, "শুয়েই থাক না কেন?" বললেন। গান্ধীজীর কোলে মাথা রেখে শুলেন। চোখ ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগলো। বার কয়েক হিক্কা হলো, গলা থেকে গর্‌গর্‌ আওয়াজ উঠলো। হা করলেন, তিনচারবার হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস টানলেন। তারপর সব স্তব্ধ॥ অবশেষে সকল বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। গান্ধীজী ভাবছিলেন কার কোলে 'বা'র শেষ নিঃশ্বাস পড়বে! শেষ সেবার অধিকারী হবে কোন ভাগ্যবান? বাপুর চেয়ে বেশী অধিকার আর কারো ছিল না।

গান্ধীজী তাঁর মাথার নীচে থেকে বালিশ সরিয়ে দিলেন এবং কাউকে বললেন মাথার দিকের উঁচু অংশকে নামিয়ে বিছানা সমান করে দিতে! বিকালে মীরাবেন বিছানাটি উত্তর দক্ষিণ করে রাখলেন। গোঁড়া হিন্দুরা মৃত্যুর আগে রোগীকে ওভাবেই শোয়ায়। প্রত্যেকেই রামধূন গাইতে সুরু করলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম প্রতিমূর্তির মত। ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও এবং বহু মৃত্যুর সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও এখনো মৃত্যুকে নির্লিপ্তভাবে দেখবার শিক্ষা বাকী আছে বুঝলাম।

'বা' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ঠিক সন্ধ্যা ৭.৩৫ মিনিটে। দেবদাসভাই তাঁর বুকের উপর মাথা রেখে বারবার ডেকে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। গান্ধীজীর চোখের কোনে ও অশ্রুবিন্দু এসে থামলো। কিন্তু নিজেকে তিনি সামলে নিলেন, উঠে দাঁড়ালেন এবং কামরা থেকে সব জিনিস সরিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজীর ভাগ্নে মথুরাদাস ত্রিকমজী পরিবারসহ 'আগা খাঁ প্রাসাদের ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ভিতরে আসবার অনুমতি পেলেন না, 'বা'কে শেষ দেখা দেখতে পেলেন না। গান্ধীজী যখন তাঁর জন্য অনুমতি পেলেন তখন 'বা' আর ইহজগতে নেই। সম্ভবতঃ সরকার ভয় পাচ্ছিলেন যে যদি বন্দিনী অবস্থায় 'বা'র মৃত্যুর খবর জনগণের মধ্যে কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। কড়া নির্দেশ দেওয়া হলো সরকারের অনুমতি ছাড়া শিবির ছেড়ে কেউ যেন বাইরে না যান।

বাপু, মনু, সন্তোকবেন এবং আমি মৃতদেহকে স্নান করালাম, চুল ধুয়ে আঁচড়ে দিলাম। গান্ধীজীর হাতে কাটা চরকার সুতোয় তৈরী শাড়ী দিয়ে তাঁকে মুড়ে দেওয়া হল। অন্তিম যাত্রার জন্য সে শাড়ী তিনি বিশেষভাবে বাছাই করে রেখেছিলেন। গঙ্গাজলে ধুয়ে

একখানা শাড়ী পাঠালেন লেডী থ্যাকারসে। সেখানা মৃতদেহ ঢাকবার দ্বিতীয় চাদর হিসাবে ব্যবহার করা হল। সন্তোকবেন গান্ধীজীর হাতে কাটা সূতো তাঁর হাতে বালার মত করে জড়িয়ে দিলেন, খুব ছোট ছোট তুলসীদানার মালা দিলেন গলায়, চন্দন দিয়ে কপাল দিলেন ভরিয়ে।

মনু এবং কানু এরই মধ্যে 'বা'র ঘর ঝাট্ দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেললো। মীরাবেন এক জায়গায় সীমা এঁকে চুনকাম করে দিলেন। তার উপর মৃতদেহ রাখা হবে। চুলে ও মাথার চারপাশে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। মৃতের মুখে প্রশান্ত হাসি এবং শান্তি। বলিরেখা যেন মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছেন। সকলেই আমরা প্রার্থনায় বসলাম। সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করা হল। দেড় ঘণ্টা ধরে হল প্রার্থনা।

শান্তিকুমার ভাই শবদাহের জন্য চন্দনকাঠের কথা উঠালেন। গান্ধীজী তা শুনলেন না, "'বা' দরিদ্রের স্ত্রী ছিলেন। চিতার জন্য চন্দন কাঠ আনবার সামর্থ্য দরিদ্রের কি করে হবে?" বন্দী শিবিরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাধা দিয়ে বললেন, "আমি চন্দন কাঠের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।" "আপনি অর্থাৎ সরকার যা ব্যবস্থা করতে চান, করতে পারেন। 'বা'র শবদাহের জন্য আপনার দেওয়া চন্দন কাঠ গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই", গান্ধীজী বললেন। একটি চন্দন গাছের সব কাঠ আনা হলো এবং শবদাহের জন্য ব্যবহার করা হলো। পরে জানা গিয়েছিল যে ঐ কাঠ সরকারের নির্দেশে সংগ্রহ করা হয়েছিল গত বৎসর গান্ধীজীর অনশনের সময় তাঁর মৃত্যু হবে ভেবে।

॥ শবদাহ ॥

'বা'র দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কারাগারসমূহের ইনস্‌পেক্‌টার জেনারেল গান্ধীজীর কাছে এসে সরকারের তরফ থেকে জিজ্ঞেস করলেন শবদাহের ব্যাপারে তাঁর কি ইচ্ছা। গান্ধীজী পরপর পছন্দসই তিনটি বিকল্প প্রস্তাব রাখলেন।

(১) "মৃতদেহ তাঁর সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদের দেওয়া হোক। এর অর্থ হলো জনসাধারণের শোভাযাত্রা হবে শব নিয়ে এবং সরকার কোন অবস্থাতেই যেন তাতে বাধা না দেয়।"

(২) "মহাদেব দেশাইয়ের শবদাহের মত আগা খাঁ প্রাসাদে 'বা'র দেহও দাহ করা হবে এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিত থাকবার অনুমতি দিতে হবে।",

(৩) "সরকার যদি আত্মীয় স্বজনদের অনুমতি দেয় ও বন্ধুদের বাদ দেয় তাহলে বাইরের কাউকেই আসবার অনুমতি না দেওয়ারই পক্ষপাতী আমি। বন্দীশিবিরের সঙ্গীরা এবং আমি শবদাহের কাজে উপস্থিত থেকে নিজেরাই সব করে নেবো।"

তিনি সরকারের কাছে আবেদন করলেন যা-ই তারা করুন না কেন রুচিপূর্ণভাবেই যেন করেন। তিনি আর খোঁচাখুচি চান না। যদি জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শব-শোভাযাত্রা চান তাহলে তাদের তিনি এ আশ্বাস দিতে প্রস্তুত যে কোন হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির জন্য ভীত হবার দরকার নেই। সে রকম কিছু প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর ছেলেরা জীবনপাত করবে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,—যদি শবদাহ বাইরে করা হয় তাহলে আপনাকে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হবে কি?

"না",—গান্ধীজী জবাব দিলেন। "আমার ছেলেরা, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গরাই সব দেখাশোনা করে সম্পন্ন করবেন। আমি বাইরে যাবোনা।"

কিন্তু সরকার জন-সাধারণ কর্তৃক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুমতি দিতে প্রস্তুত নন। জনতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অর্থ বিরাট মিছিল। এর ফলে জনজাগরণ এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার হবে বেশী। এরকম ঝুঁকি কি করে তাঁরা নেবেন? সেজন্য দ্বিতীয় প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন।

তখন প্রায় রাত ১১টা। এই সময়ের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। দেবদাসভাই, মনু এবং সন্তোকবেন ছাড়া বাকী বাইরের সমস্ত দর্শনার্থীদেরই বন্দীশিবির ছেড়ে চলে যেতে বলা হল। আমরা পালাক্রমে মৃতদেহের দিকে লক্ষ্য রাখলাম। সকালবেলাকার প্রার্থনা হল 'বা'র মৃতদেহের কাছে বসে। গান্ধীজী তাঁর শিয়রের কাছে বসলেন এবং দাহের জন্য নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসেছিলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, সকাল ৭টা থেকেই বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের আসা সুরু হল। প্রায় দেড়শো জনের উপস্থিতি। মনু মশরুওয়ালা মৃতদেহের আরতি করলেন। সকলেই প্রণাম করলেন। ফুলের স্তবক স্তূপ হয়ে উঠল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বন্ধুরা,—হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান এবং ইংরেজ,—উপস্থিত ছিলেন। মহাদেবভাইয়ের শেষকৃত্য যিনি করেছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এলেন। তিনি দেবদাসভাইকেই বললেন মায়ের শেষকৃত্য সম্পাদন করতে।

চিতার উপর শবদেহ রাখার পর গান্ধীজী কিছুক্ষণের জন্য প্রার্থনা করলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং পার্শী প্রার্থনার কিছু কিছু অংশ ওতে ছিল। দেবদাসভাই আগুন জ্বালালেন।

শান্তিকুমারভাই সমস্তক্ষণই দেবদাসভাইকে সাহায্য করলেন।

চিতা সাজানোয় কিছু ত্রুটি হয়েছিল। আগুন জ্বলবার পর আরও কাঠ দেওয়া এবং মৃতদেহের নীচে তা পৌঁছানো কঠিন ব্যাপার হলো। কাঠ দিতে গিয়ে কানু গান্ধীর চুল এবং চোখের পাতার লোম ঝলসে গেল। মহাদেবভাইয়ের সমাধির পাশেই চিতা সাজানোর ব্যবস্থা করা হলো। আমার মনের মধ্যে চিন্তা এলো যে 'বা'র কোমল মাতৃহৃদয়ে মহাদেবভাইকে ছেড়ে যাবার ধারণাও সহ্য হতো না, যে মহাদেবভাই আগাগোড়া 'বা' ও বাপুর কাছে ছেলের চেয়েও বেশী ছিল, তিনি তার সঙ্গেই পেছনে থেকে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

'বা'র দেহে জল জমেছিল। শব দাহ হতে অনেকক্ষণ সময় নেয়। গান্ধীজী এবং অনেক বন্ধুবান্ধব বিকাল ৪টা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত থাকেন। বহুবার তাঁকে বলা হল চলে এসে বিশ্রাম নিতে, কিন্তু তা করতে তিনি অসম্মত হলেন। "বাষট্টি বৎসরের সাথীকে এ ভাবে ফেলে কি যেতে পারি? তা করলে আমি নিশ্চিত, সে আমায় ক্ষমা করবে না," তিনি জবাব দিলেন হেসে। কিন্তু বিচ্ছেদের তীব্র যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা তাঁর হচ্ছিল। তিনি একজন ঋষি এবং বিখ্যাত পুরুষ, কিন্তু তা সত্বেও মানব-প্রকৃতির বাইরে ছিলেন না। যখন সকলেই চলে গেলেন তাঁর বুকের মধ্যে কি হচ্ছিল আমরা তার ক্ষীণ আভাস পেলাম। রাত্রিবেলা নিজের বিছানায় শুয়ে তিনি মন্তব্য করলেন,—" 'বা'কে ছাড়া আমার জীবন কল্পনা করতে পারি না। আমি চাইতাম তিনি যেন চলে যান আমি বেঁচে থাকতেই। তাহলে আমার অবর্তমানে তাঁর কি অবস্থা হবে সে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু অদৃশ্য হলেও তিনি আমার এক অংশ। তাঁর চলে যাওয়ায় আমার জীবনের সে শূন্যতা আর কখনোই পূর্ণ হবে না।" পরিবেশে নীরবতা, কিছু সময়

পর্যন্ত। তারপর তিনি ফিরলেন আমার দিকে,—"ভগবান কেমন ভাবে আমার বিশ্বাসের পরীক্ষা করছেন। যদি পেনিসিলিন দেবার অনুমতি দিতাম, তা তাঁকে বাঁচাতে পারতো না। কিন্তু আমার দিক থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাসে দেউলিয়া হতাম আমি। দেবদাসের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি আমার সিদ্ধান্ত অকাট্য সেকথা বুঝাবার জন্য। পেনিসিলিন পরীক্ষা করে দেখা বন্ধ করা হল এবং 'বা' যাবার জন্য হলেন প্রস্তুত। আমার কোলে তাঁর দেহাবসান হলো। এর চেয়ে বেশী ভালো আর কি হতে পারতো? আমার আনন্দের সীমা নেই।"

রামদাসভাই অনেক দেরীতে, বিকালের দিকে উপস্থিত হলেন। তখনও চিতা জ্বলছে। দেবদাসভাই ও রামদাসভাই আগা খাঁ প্রাসাদের মধ্যে থাকবার অনুমতি পেলেন তিন দিনের জন্য চতুর্থদিন পূতাস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করে দুই ভাই চলে গেলেন, পেছনেই রেখে গেলেন তাঁদের মায়ের অবশিষ্ট যা কিছু সবই।

প্রতিদিন দুই সমাধিতে সকাল বিকাল দুবেলা আমরা পুষ্প অর্ঘ্য দিতাম। সকালে সমাধির কাছে বসে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পড়তাম। মহাদেবভাইয়ের সমাধির পাদমূলে গান্ধীজী ফুল দিয়ে ক্রশ্ তৈরী করতেন। 'বা'র সমাধির পাদমূলে ফুল দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। কিছু লোক ভাবতেন গান্ধীজী মূর্তিপূজা করছেন বুঝিবা। আমাদের দৈনিক দুই সমাধিতে তীর্থযাত্রা মূর্তিপূজা নয়। মহাপ্রস্থান করা দুই আত্মার মহান্ গুণাবলীর কাছে শ্রদ্ধানত হওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা ওঁদের পদক্ষেপকে অনুসরণ করার শক্তি দিন যেন আমাদের।
